হিন্দুস্থানী রমণী। —উইলিয়ম হজেস

মুখবন্ধ

সালটা যতদূর মনে পড়ে ১৯৫৯। প্রয়াত সরোজ আচার্য আমাকে একটি বই দেন, পুরনো বইয়ের দোকানে কেনা, নাম India Illustrated। বলেন, এই বইটাতে উইলিয়ম ড্যানিয়েলের আঁকা অনেকগুলি এনগ্রেভিং আছে। মনে হয় শিল্পী এদেশে এসেছিলেন। এঁর সম্পর্কে খোঁজ-খবর করে দেখুন, একটা ভালো লেখা হতে পারে। ছবি তো আছেই।

বিষয়টা সম্পর্কে তখন কিছুই জানি না এমনকি কোথায় খুঁজতে হবে তাও জানি না। গেলাম শ্রীবিনয় ঘোষের কাছে। যে-সব বিদেশী শিল্পী আঠারো-উনিশ শতকে ভারতে এসেছিলেন তাঁদের সম্পর্কে তাঁর একটা লেখা দু-কিস্তিতে বেরিয়েছিল অধুনা লুপ্ত 'সুন্দরম্' পত্রিকায়। বিনয়বাবু আমার অনেককালের পরিচিত। তাঁর কাছ থেকে বিষয়টা সম্পর্কে কিছুটা হদিশ পাওয়া গেল। পরে তাঁর কাছ
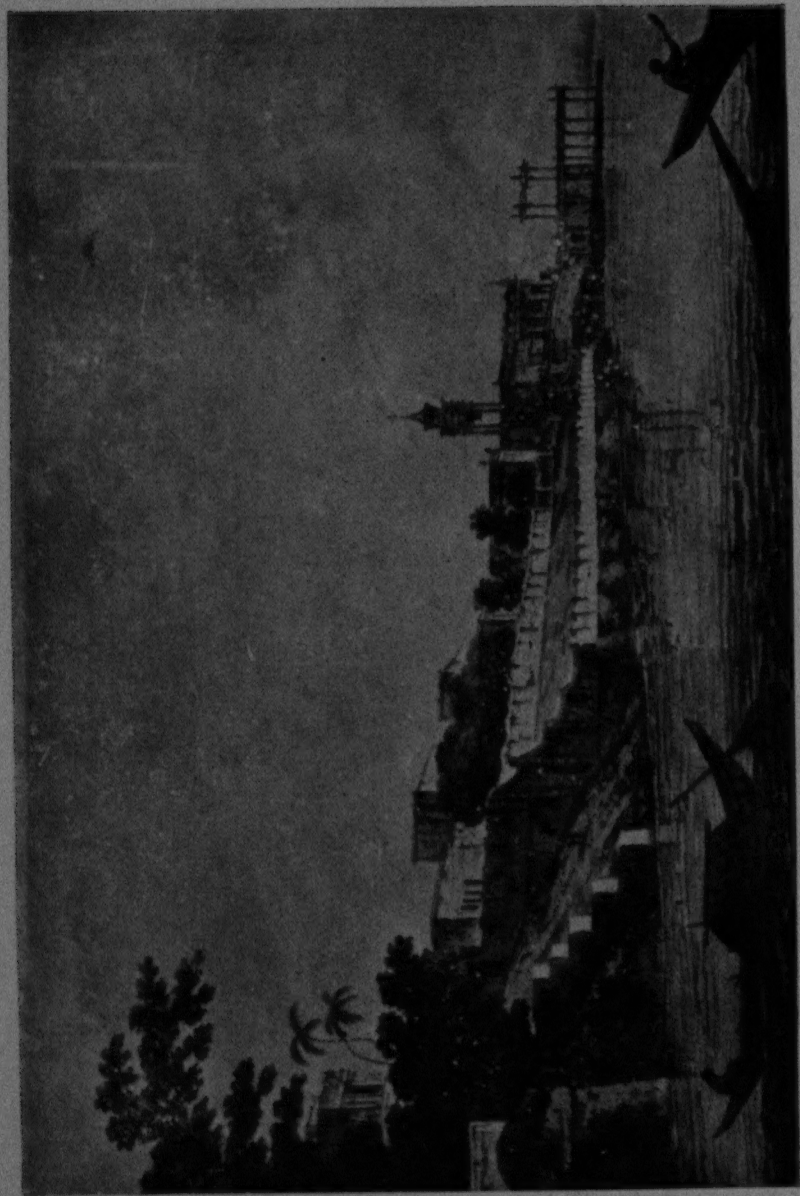
ওলন্দাজ অধিকৃত চুঁচুড়ার দৃশ্য। বাড়িটি ওলন্দাজ গবর্নর ও তার কাউন্সিলের সদস্যদের বাসস্থান। এখানে একটি দুর্গ ছিল আর তার মধ্যে ছিল ওলন্দাজদের ফ্যাক্টরি। —উইলিয়ম হজেস

থেকে কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য বইও পেয়েছি। এই সুযোগে সেজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তারপর যাতায়াত শুরু করলাম ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। সেখানে স্বর্ণখনির সন্ধান পাওয়া গেল। যা চাই, তার প্রায় সবই আছে। অতএব লেখা হল, প্রথমে ড্যানিয়েলদের সম্পর্কে, তারপর একে একে আরও অনেকের সম্পর্কে।

আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগের সম্পাদক শ্রীরমাপদ চৌধুরীর উৎসাহে ও আনুকূল্যে এই পর্যায়ের প্রায় সবগুলি লেখাই ১৯৫৯-৬০ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত। বলতে দ্বিধা নেই, তাঁর কাছ থেকে সর্বপ্রকার সাহায্য পেয়েছিলাম বলেই এই রচনাগুলি লিখিত হতে পেরেছিল।

তারপর প্রায় আঠারো বছর কেটে গেছে। লেখাগুলি ফাইলজাত হয়ে পড়েছিল। এখন বন্ধুবর শ্রীঅজয় গুপ্তর সানুগ্রহ সহযোগিতায় সেগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করে প্রকাশ করা হল।

আগেই বলেছি এই প্রবন্ধগুলির প্রায় সবকটিই প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগে, একটি কি দুটি 'সপ্তাহ'-তে এবং দুটি প্রবন্ধ কোথাও প্রকাশিত হয়নি। অধিকাংশ লেখাই কিছু কিছু সংশোধন-সংযোজন করা হয়েছে।

এটা ঠিক গবেষণামূলক গ্রন্থ নয়—তাই অযথা ফুটনোট কণ্টকিত করা হয়নি পৃষ্ঠাগুলিকে। শেষে অবশ্য বিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া হয়েছে। যাঁরা বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তৃততরভাবে জানতে চান, এই গ্রন্থপঞ্জী তাঁদের কিছুটা কাজে লাগবে।

প্রতোষ গুহ
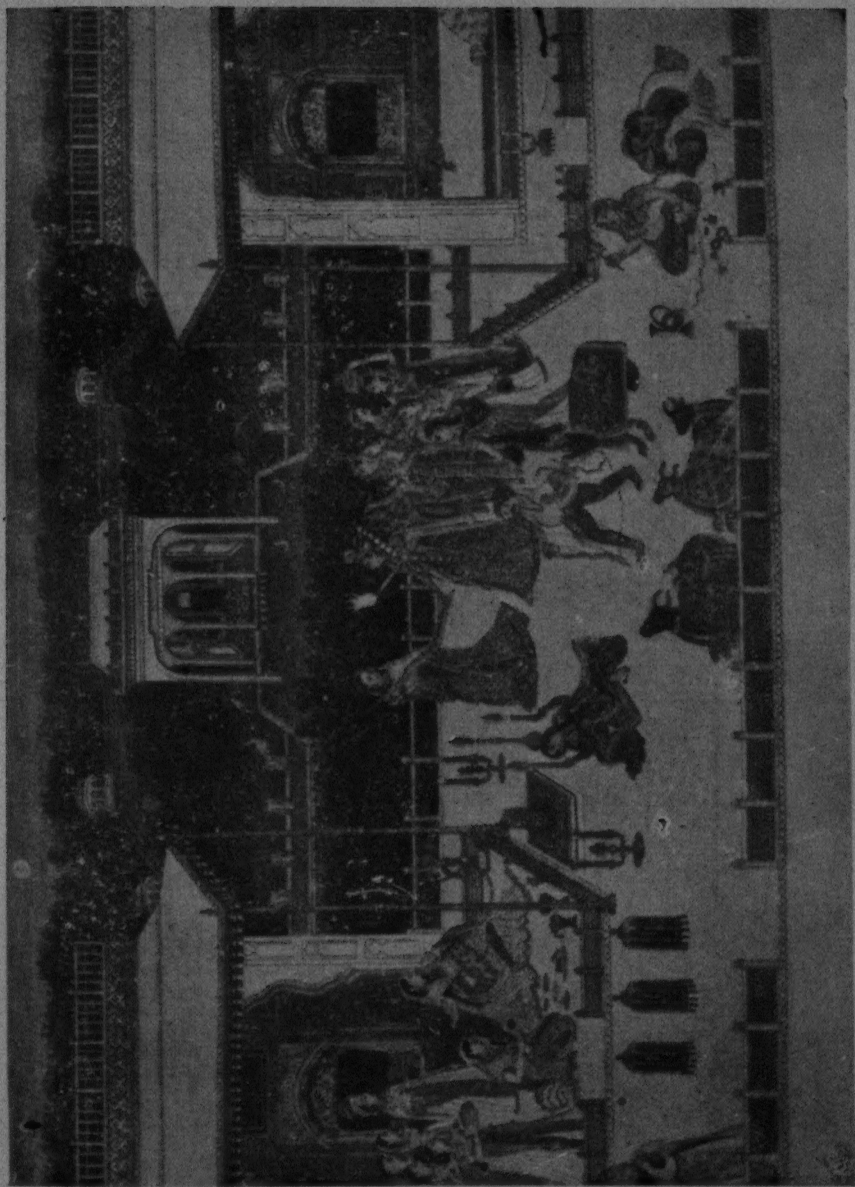
জেনানা মহলের অভ্যন্তরের দৃশ্য। পুরাতন রাজপুত চিত্রকলার এই নিদর্শনটি হজেস তাঁর 'ট্রাভলস ইন ইণ্ডিয়া'-য় ব্যবহার করেছেন।

সূচী

চিত্রসূচী

হিন্দুনারী শোভাযাত্রা করে সহমৃতা হতে চলেছে। —উইলিয়ম হজেস

ফোর্ট উইলিয়ম থেকে কলকাতার দৃশ্য। —উইলিয়ম হজেস

সেকালের বাঙলাদেশের একটি খামার বাড়ির দৃশ্য । —উইলিয়ম হজেস

মুসলিম মোল্লা। —উইলিয়ম হজেস

লর্ড কর্নওয়ালিস টিপু সুলতানের পুত্রকে জামিন হিসাবে গ্রহণ করছেন।

—জন জোফানি

হায়দরবেগের দৌত্য—জন জোফানি

ক্লদ মাটিন এবং তাঁর বন্ধুগণ—জন জোফানি

ব্রাহ্মণ কন্যা ঘাটে এসেছে গাগরী ভরনে
—উইলিয়ম ড্যানিয়েল

সেকালে ইংরেজ 'নবাব'দের শতাধিক ভৃত্য থাকতো। তার মধ্যে একজনের কাজ ছিল জল ঠাণ্ডা করা। তার নাম আপদ্দার।

উইলিয়ম ড্যানিয়েল

হিন্দু মেয়েরা ঘাটে প্রদীপ ভাসিয়ে দিচ্ছে - উইলিয়ম ড্যানিয়েল

চৌরঙ্গীর অংশ—উইলিয়ম ড্যানিয়েল

চিৎপুর রোড—টমাস ড্যানিয়েল

সেকালের এস্‌প্লানেড—টমাস ড্যানিয়েল

মহীশূরের নির্বাচিত দৃশ্য থেকে—রবার্ট হোম

মহীশূরের নির্বাচিত দৃশ্য থেকে — রবার্ট হোম

মহীশূরের নির্বাচিত দৃশ্য থেকে—রবার্ট হোম

মাদ্রাজের সমুদ্রোপকূলে মাছ ধরা—জর্জ চিনারি

জেলেদের বড় ডিঙি—জর্জ চিনারি

তিন রমণী—জর্জ চিনারি

মাদ্রাজের উপকণ্ঠে—সালতিকভ
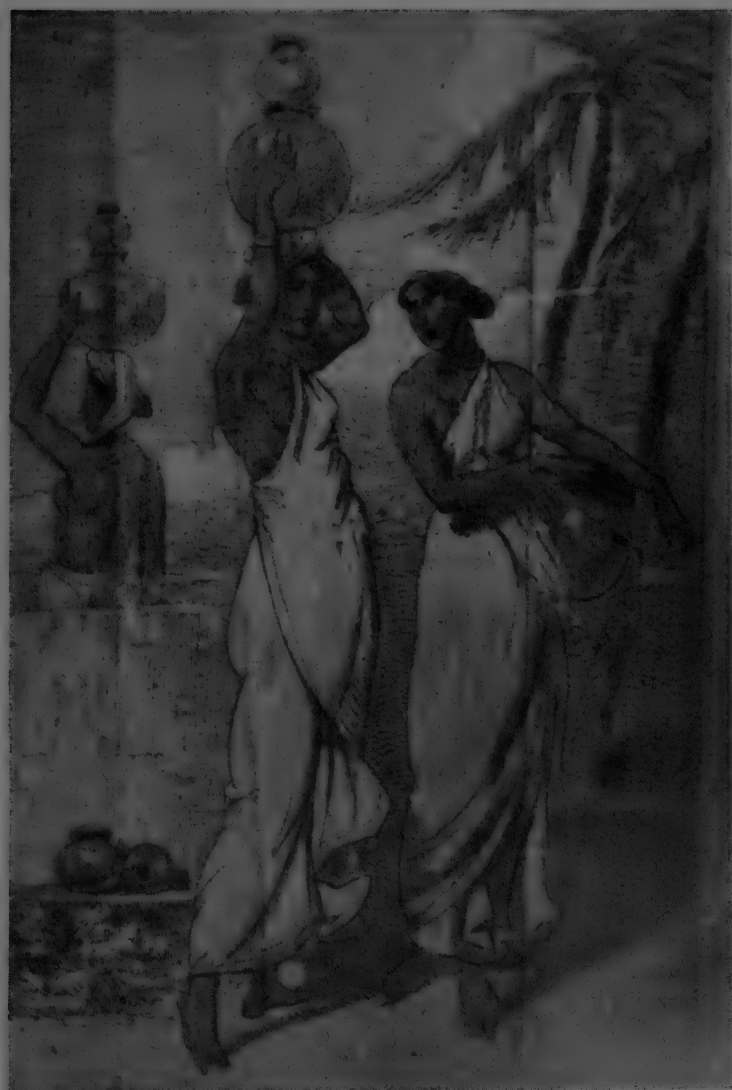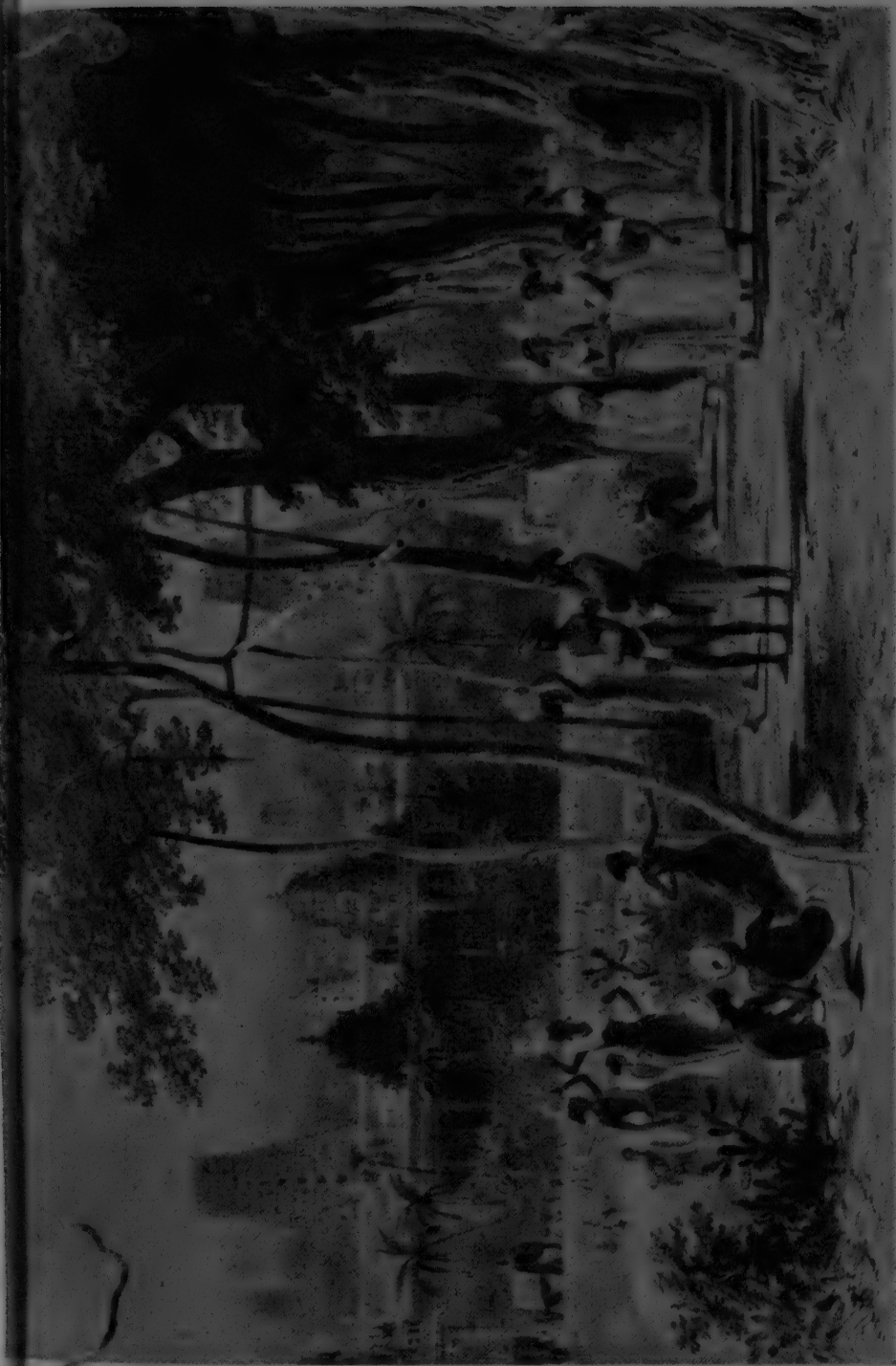
বাজিকর—সামোকিশ
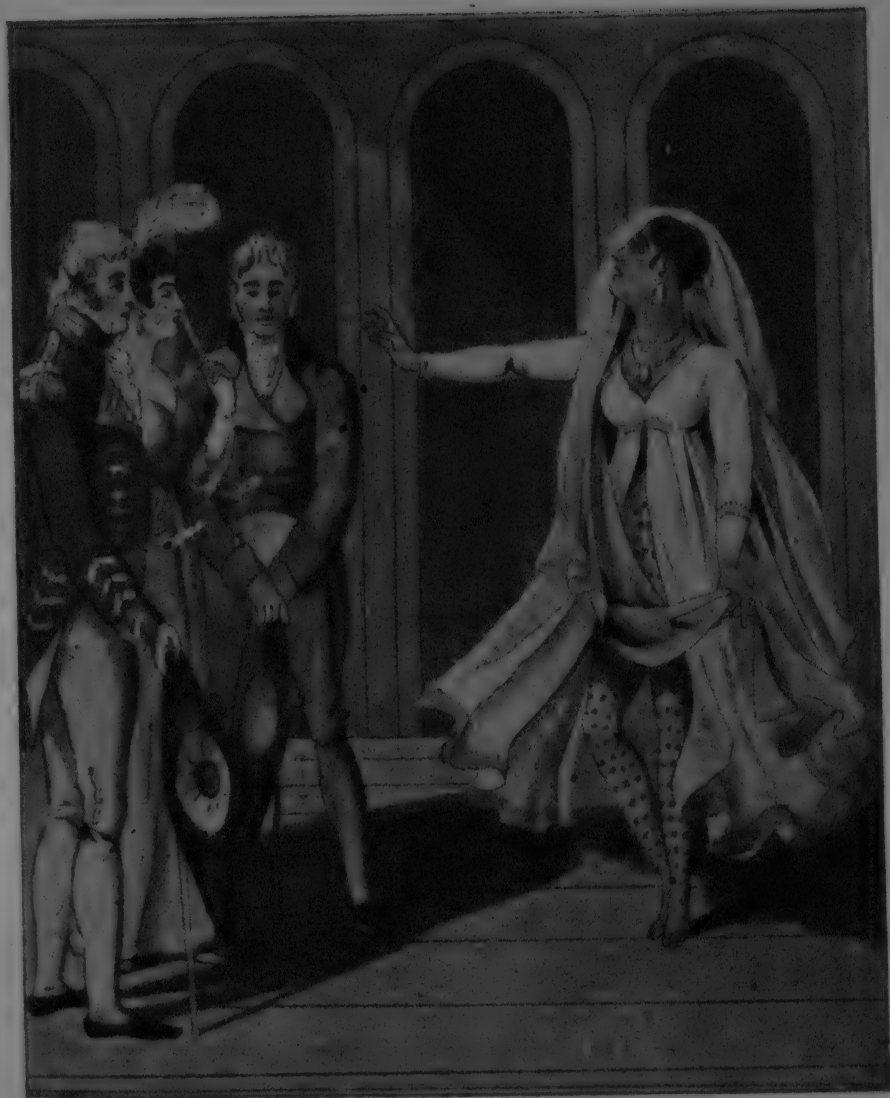
সাহেব-বিবির দল বাঙালী বাবুর বাড়ি বাঈ নাচ দেখছেন।—চার্লস ডয়েলি

সাহেবের প্রসাধন। চারজন ভৃত্য তার তদারক করছেন। —চার্লস ডয়েলি

সাহেববাবু তাম্রকূট সেবন করছেন আর হুঁকোবরদার ছিলিমের তদারক করছেন। —চার্লস ডয়েলি

সেকালের ক্লাইভ স্ট্রিটের দৃশ্য —চার্লস ডয়েলি

সেকালের ধর্মতলার দৃশ্য। সেক্রেড হার্ট চার্চটি এখনও যথাস্থানে বিদ্যমান আছে। —চার্লস ডয়েলি

আলিপুরের ঝুলন পুল। বর্তমানে এটির অস্তিত্ব নেই। —চার্লস ডয়েলি

শিবপুরের বিশপস্ কলেজ : মাইকেল মধুসূদন দত্ত এখানে পড়েছেন। বর্তমানে এখানে বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয়েছে। —চার্লস ডয়েলি
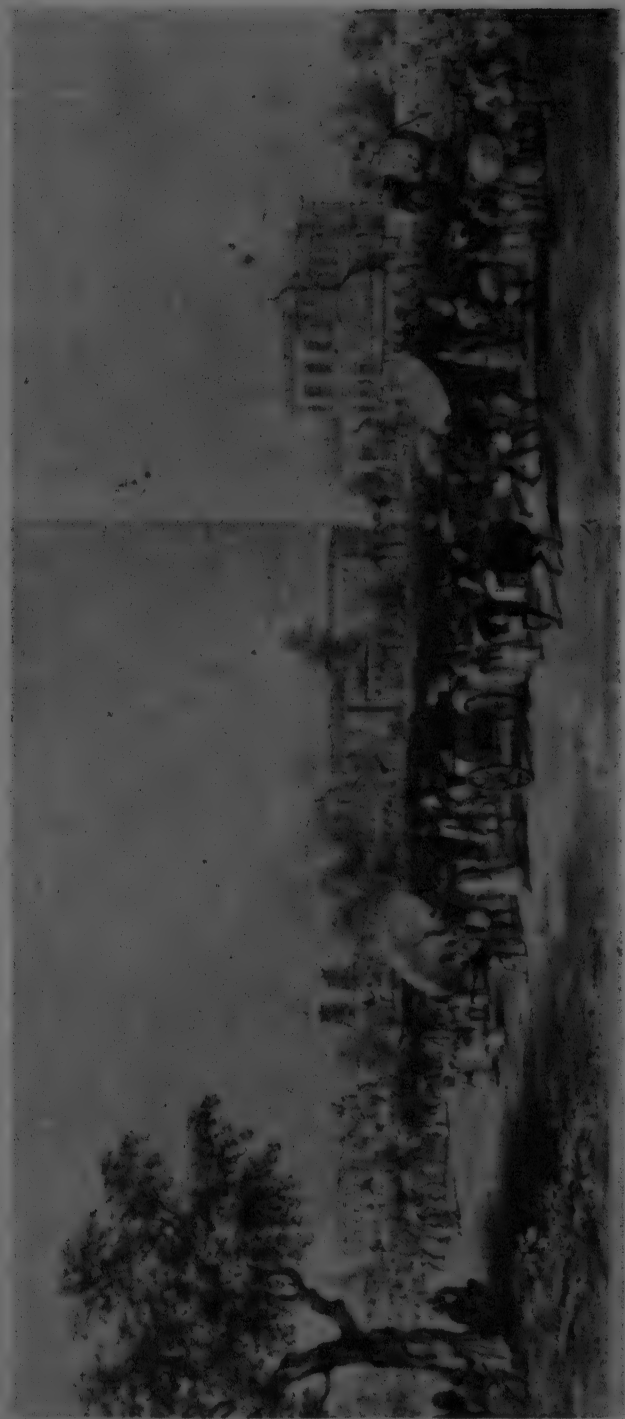
কলকাতায় চড়কপূজার মিছিল। — চার্লস ডয়েলি

বড়বাজারে নানান মুখের মেলা —কোলেসওয়াদি গ্রান্ট

জলের কুঁজো —কোলেসওয়াদি গ্রান্ট

সেকালের ইওরোপীয়দের বসবার ঘর —কোলেসওয়াদি গ্রান্ট

উটের গাড়ি —আ্যাটকিনসন

ঘোড়-দৌড়ের মাঠ : দাঁড়ি-পাল্লায় জকিকে ওজন করা হচ্ছে —অ্যাটকিনসন
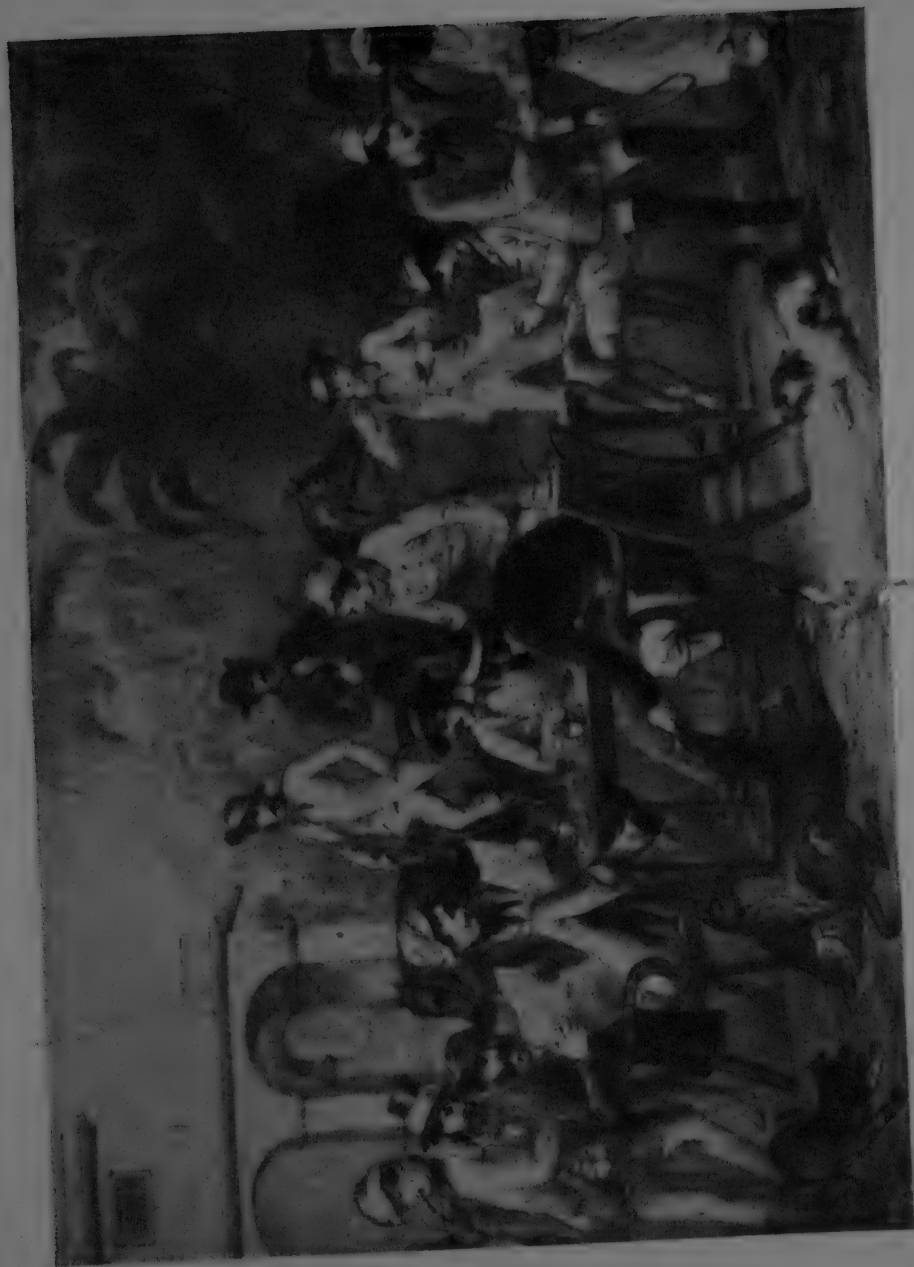
কফিখানার দৃশ্য —অ্যাটকিনসন

সাহেব-বিবিদের বল-নাচের আসর —অ্যাটকিনসন

পাদ্রী সাহেব খ্রীস্টধর্মের মহিমা প্রচার করছেন —অ্যাটকিনসন

বিয়ের ঘণ্টা বেজেছে, পাল্কী চেপে বরকনে চলেছে গীর্জার দিকে —অ্যাটকিনসন

হুঁকো খাওয়া —সলভিন্স

বালক —সলভিন্স

৮

তাঁতী —সলভিন্স

দৈবজ্ঞ —সলভিন্স

পক্ষীমার —সলভিন্স

হুকাবরদার —সলভিন্স

পেয়াদা — সলভিন্স

হরকরা —সলভিন্স

বিদ্রোহী সিপাহিদের কামানের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। —ভেরেশ্চাগিন

সেকালের ধনী ব্যক্তির শকট। —ভেরেশ্চাগিন

দুই ফকির — ভেরেশ্চাগিন

শিল্পীদের অভিযান

ভারতবর্ষের ধনসম্পদ এককালে ছিল প্রবাদবাক্য। লোকে বলতো ভারতবর্ষের পথে পথে সোনা ছড়ানো আছে, কুড়িয়ে নিতে পারলেই হলো। আছে কল্পতরু। তার কাছে যা চাওয়া যায় তা-ই পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্যের এই খ্যাতি যুগে যুগে প্রলুব্ধ করেছে বলদর্পী দিগ্বিজয়ীকে আর ধূর্ত বণিককে। সমুদ্রের ওপার থেকে প্রথম এসেছে পোর্তুগীজ, তারপর ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসীরা। তারপর ইংরেজরা তাদের অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের হটিয়ে দিয়ে কীভাবে এদেশে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার অর্জন করে এবং কীভাবে ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড না পোহাতে শর্বরী রাজদণ্ডরূপে দেখা দেয় তা তো সুবিদিত। জন্মসূত্রে কলকাতা মহানগরী ইংরেজের বাণিজ্যসূত্রের সঙ্গে বাঁধা। ১৬৯০ সালে জব চর্নক সুতানুটিতে ইংরেজের বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন। কালক্রমে এই সুতানুটি-কলকাতা হয়ে ওঠে ইংরেজের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ও রাজধানী।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ইংরেজ ও অন্যান্য ইওরোপীয় বণিকেরা অনেকে কলকাতা আসতে থাকেন, আর আসতে থাকে 'রাইটার', 'ফ্যাক্টর' ও অন্যান্য কর্মচারীরা। এরা সৎ-অসৎ নানা উপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে দেশে ফিরে যেত। একমাত্র বাঙলা দেশ থেকেই (১৭৫৭ থেকে ১৭৬৬ সালের মধ্যে) কোম্পানি এবং তার কর্মচারীরা ৬,০০০,০০০ পাউণ্ড উৎকোচ হিসাবে আদায় করেছিল।[১] দেশীয় রাজাদের কাছ থেকে উৎকোচ এবং 'উপঢৌকন' আদায় করে ক্লাইভ রাজার-সম্পত্তি করে দেশে ফিরেছিলেন। এদের এভাবে আঙুল ফুলে কলাগাছ হতে দেখে অনেক ভাগ্যান্বেষী শ্বেতাঙ্গই তখন কালা আদমীদের দেশে আসবার সুযোগ খুঁজত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে শাসন-ক্ষমতা ইংরেজদের হস্তগত হবার পর তাদের অনেকের মনোবাসনা পূর্ণ করার সুযোগ হয়। শুধু ভাগ্যান্বেষীরাই নয়, অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিও তখন থেকে এদেশে আসতে থাকেন। তাঁদের সংসর্গে কলকাতা ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে ভারতের আধুনিক সংস্কৃতি-কেন্দ্র এবং প্রধান আকর্ষণস্থল।

এই সময়ই ভারতবর্ষে ইংরেজ শিল্পীদের অভিযান শুরু হয়। ১৭৬৯ সালে মাদ্রাজে শিল্পী টিলি কেটল-এর (Tilly Kettle) আগমনেই এই অভিযানের সূচনা। তারপর থেকে ১৮২০ সালের মধ্যে আরও প্রায় ৬০ জন শিল্পী ভারতবর্ষে আসেন।[২]

কোন্ চুম্বকের আকর্ষণ ইংরেজ শিল্পীদের এদেশে টেনে আনত? এই প্রশ্নের জবাবে বলতে হয়, এ-সেই একই চুম্বক যা তাঁদের অন্যান্য স্বদেশবাসীকে এদেশে আকৃষ্ট করেছে, অর্থাৎ ভাগ্য ফেরাবার আশা। স্বদেশে শিল্পীর ভিড় বেশি, প্রতিযোগিতা কঠোর—কি জানি কল্পতরুর দেশ ভারতবর্ষে ভাগ্যদেবী হয়তো গলায় পরিয়ে দেবেন বরমাল্য। দেশে বসেই তাঁরা শুনতে পেতেন কোম্পানির আবু হোসেন কর্মচারীরা দুহাতে পয়সা ওড়াচ্ছে। তাদের কাছে শিল্পকলার খুবই কদর এখন। তাদের দেখাদেখি ভারতীয় রাজারাজড়াও হয়ে উঠেছেন পশ্চিমী

চিত্রকলার মস্ত এক একজন পেট্রন। সুতরাং কোনরকমে একবার এদেশে পৌঁছতে পারলে আর ভাবনা নেই।[৫]

টিলি কেট্‌ল-এর ভাগ্যান্বেষণ ব্যর্থ হয়নি। বেশ মোটা রকমের বিত্ত সঞ্চয় করেই দেশে ফিরেছিলেন তিনি। এই বিত্তের জোরেই দেশে ফিরে বিয়ে-থা করে বণ্ড স্ট্রিটে বাড়ি হাঁকিয়েছিলেন।

কিন্তু দেশে ফিরে দশ বছরের মধ্যে কেটল বিত্তহীন হয়ে পড়েন। লণ্ডন এবং ডাবলিন কোথাও তিনি সুবিধে করে উঠতে পারলেন না। বাঙলাদেশের সচ্ছল দিনগুলি তাঁকে আবার হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে। তিনি আবার প্রাচ্যদেশ অভিমুখে রওনা হন। কিন্তু পথিমধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর বয়েস মাত্র ৪৫ বছর।[৬]

কিন্তু সে যাই হোক, টিলি কেটল-এর প্রাথমিক সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে অনেক শিল্পীই এদেশে আসার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। তাঁদের এই আগ্রহের বৈষয়িক ভিত্তি সত্যিই ছিল। জোফানি দেশে ফিরে-ছিলেন নগদ ১০ হাজার পাউণ্ড নিয়ে। চার্লস স্মিথ ছিলেন একজন মাঝারি ধরনের শিল্পী। তাঁর উপার্জনের পরিমাণ ছিল ২০ হাজার পাউণ্ড। একখানা পোর্ট্রেট আঁকার জন্য হিকিকে দক্ষিণা দিতে হতো ২৫০ পাউণ্ড। বিচির দক্ষিণা ছিল ৭০০ পাউণ্ড। জন টমাস সিটন দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন ১২ হাজার পাউণ্ড, আর কলকাতা থাকার সময় থাকা-খাওয়ার জন্য ব্যয় করেছিলেন ৬৩ হাজার টাকা। হজেসও ভারতে বেশ দু'পয়সা করেছিলেন।

১৭৭০ সাল থেকে শিল্পীরা সব একজন দু'জন করে ভারতে আসতে থাকেন।[৭]

কলকাতা শহরে বিদেশী চিত্রশিল্পীদের আনাগোনার এই বিবরণ কিছুটা পাওয়া যায় সেকালের পত্রপত্রিকার 'নোটিস' বা বিজ্ঞপ্তিতে। শিল্পীরা এসে খবরের কাগজে নোটিস ছেপে তাঁদের আগমন-বার্তা ঘোষণা করতেন। যেমন ধরা যাক, ১৭৮৪ সালের ৪ মার্চের 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকার এই বিজ্ঞাপনটি :

To the Lovers of Art in India.

Captain Francis Swain Ward of the Madras Establishment, whose paintings and drawings of Gentoo Architecture etc. are well known and esteemed in Europe and India, having been solicited by many of his well-wishers to publish his works, which are of too extensive a nature for him to effect without support, makes known, by the channel of this paper his intention of publishing by subscription twelve views of curious buildings etc. all taken on the spot by himself. They are proposed to be on a large scale, and will be engraved by the first masters in England.

The price will be twentyfive pagodas or one hundred Rupees for each set. Subscriptions will be received by Mr. J. M'clary, or at the shop of Messrs. Williams and Rankin, in Calcutta.

ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস সোয়েন ওয়ার্ড 'জেন্টু' বা হিন্দু স্থাপত্যের চিত্রাঙ্কনে দক্ষ শিল্পী। তাঁর দক্ষতার কথা ইওরোপ ও ভারতের গুণী মহলে সুবিদিত। তাঁর গুণগ্রাহীদের একান্ত ইচ্ছা যে তিনি একটি চিত্রসংকলন প্রকাশ করেন। কিন্তু এটা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার বলে তিনি অগ্রিম চাদা তুলে সংকলনটি প্রকাশ করতে চান। ইংলণ্ডের সেরা এনগ্রেভাররা তাঁর চিত্রগুলি খোদাই করবেন। প্রতিটি সেটের দাম হবে একশ টাকা। উইলিয়মস অ্যাণ্ড র‍্যানকিনের দোকানে অগ্রিম দক্ষিণা গ্রহণ করা হবে।*

যে-সব শিল্পীরা আসতেন তাঁরা শুধু ছবি এঁকেই পয়সা রোজগার করতেন তা নয়, কেউ কেউ ছবি আঁকা শিখিয়েও মোটা দক্ষিণা আদায়

করতেন। পত্র-পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি থেকে এ-তথ্যও পাওয়া যায়। যেমন ধরা যাক ১৭৮৪ সালের 'ক্যালকাটা গেজেট'-এ প্রকাশিত নিম্নোক্ত বিবৃতিটি :

> Mr. Hone presents his compliments to the ladies and gentlemen of this settlement and proposes to lay apart three days in the week for the purpose of teaching drawing or painting. Those ladies and gentlemen who wish to be taught that polite art by Mr. Hone may know his terms by sending a chit, or waiting on him at his house in the Rada Bazar.

অর্থাৎ রাধা বাজারের মিঃ হোন সপ্তাহে তিন দিন ভদ্রমহোদয় ও মহিলাদের ছবি আঁকা শেখাবেন বলে মনস্থ করেছেন। যাঁরা এই সুযোগ নিতে চান, মিঃ হোনের কাছে চিঠি লিখে বা সরেজমিনে তাঁর কাছে গিয়ে শর্তাদি জানতে পারেন।'

দক্ষিণা কিরূপ ছিল এই বিজ্ঞপ্তি থেকে তা অবশ্য স্পষ্ট নয়, তবে তা যে নিতান্ত কম ছিল না তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

মিঃ হোনের মতো যাঁরা ছবি আঁকা শেখাতেন তাঁদের দক্ষিণা কিরূপ ছিল তা না জানা গেলেও, যাঁরা পোর্ট্রেট আঁকতেন তাঁরা যে মোটা হারে দক্ষিণা পেতেন তাতে সন্দেহ নেই। এ-সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়াও যায়। যেমন ধরা যাক এই বিজ্ঞাপনটি :

> **Portrait Painting**—Mr. Moris having taken a house in Wheeler Place, directly behind the Governor's house, begs leave to such ladies and gentlemen who may be inclined to favour him with their sittings, that he is ready to paint them at the following pirces :—

A head size	**15 gold mohurs**
Three Quarters	**20 Do Do**
Kit Cat	**25 Do Do**
Half Length	**40 Do Do**
Whole Length	**80 Do Do**

Calcutta. 5th April 1798

মি: মরিস খুব একটা নাম-করা শিল্পী ছিলেন না। তাঁর দক্ষিণার হারই যখন ছিল—হেড সাইজ ১৫ স্বর্ণ মোহর, থ্রি-কোয়ার্টার ২০ স্বর্ণ মোহর, কিটক্যাট ২৫ স্বর্ণ মোহর, হাফ সাইজ ৪০ স্বর্ণ মোহর এবং ফুল সাইজ ৮০ স্বর্ণ মোহর তখন জোফানি প্রমুখের দক্ষিণা যে কিরূপ ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়।

কেবল পোর্ট্রেটই নয়, সব রকম ছবির দামই ছিল খুব বেশী। বেইলি সাহেব ১৭৯৪ সালে কলকাতা শহরের কয়েকটি নির্বাচিত দৃশ্য তাম্রপটে খোদাই করে প্রিণ্ট করেছিলেন। তিনি এই প্রিণ্টের প্রত্যেকটির (১৫ইঞ্চি × ১১ ইঞ্চি) দাম ধার্য করেছিলেন ১৫ টাকা এবং নয়টি দৃশ্যের একটি সেটের দাম ৮০ টাকা।

১৭৯৫ সালে টমাস ড্যানিয়েল হিন্দুস্থানের ২৪টি দৃশ্যের একটি সেট প্রকাশের প্রস্তাব প্রকাশ করেছিলেন। দাম ধার্য হয়েছিল পুরো সেটটির জন্য ২০০ সিক্কা টাকা।

সলভিন্সের ২৫০টি এনগ্রেভিং-এর দাম ধরা হয়েছিল ২৫০ টাকা।[৮]

সেকালে এই টাকার মূল্য কী ছিল এখন তা কল্পনা করাও কঠিন।

কাজের ধারা হিসেবে এই সব শিল্পীদের মোটের উপর তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে পড়েন টিলি কেটল (১৭৬৯-৭৬) জোফানি[৯] (১৭৮৩-৮৯), আর্থার ডেভিস (১৭৮৫-৯৫) প্রমুখ। এঁরা সকলেই ছিলেন স্বদেশে খ্যাতিমান, সকলেই পোর্ট্রেট আঁকতেন

আর সকলেই ছিলেন তেল-রঙের কাজে সিদ্ধহস্ত।

দ্বিতীয় ভাগে পড়েন জন স্মার্ট (১৭৮৫-৯৫), ওজিয়াস হামফ্রি (১৭৮৫-৮৭) স্যামুয়েল অ্যাণ্ডরুজ (১৭৯১-১৮০৭) ডায়না হিল (১৭৮৬-১৮০৭), জর্জ চিনারী (১৮০২-২৫)। হাতির দাঁতের উপর মিনিয়েচার পোর্ট্রেট অঙ্কনে পারদর্শী ছিলেন এঁরা।

তৃতীয় ভাগে যাঁরা পড়েন তাঁরা আঁকতেন জল-রঙের ছবি। কেউ কেউ আবার এ-থেকে পরে এনগ্রেভিং, অ্যাকোয়াটিন্ট বা লিথোগ্রাফ তৈরি করতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয়-ভাগে ইংলণ্ডে এই ধরনের প্রিন্টের খুবই চলন হয়েছিল।[১০]

এই তৃতীয়ভাগের শিল্পীরা প্রধানত আঁকতেন ল্যাণ্ডস্কেপ বা প্রাকৃতিক দৃশ্যচিত্র। এই দলের শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে সাফল্য অর্জন করেছেন উইলিয়ম হজেস (১৭৮০-৮৩) এবং টমাস ও উইলিয়ম ড্যানিয়েল, খুড়ো-ভাইপো।

প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগের শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা পড়েন তাঁদের মধ্যে অনেকেই অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁদের রচনার ঐতিহাসিক এবং শিল্পমূল্য অবশ্যই আছে। সেই ক্যামেরাহীন যুগে ইতিহাসের নায়ক-নায়িকারা কেমন দেখতে ছিলেন এই সব পোর্ট্রেট ছবিগুলি আমাদের তা জানিয়ে দেয়।

কিন্তু তৃতীয় ভাগের শিল্পীরা এঁকেছিলেন এ-দেশের ঘর-বাড়ি, বন-পাহাড়, মানুষ-জনের ছবি। এঁরা পয়সা পেয়েছেন হয়তো কম, কিন্তু যে-সব ছবি তাঁরা রেখে গেছেন তার শিল্পমূল্য যাই হোক, ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়।

সেকালে এদেশের ভৌগোলিক সংস্থান কেমন ছিল, কেমন ছিল এদেশের মানুষের জীবনযাত্রা, পোশাক-আশাক, আচার-ব্যবহার—তার একটি প্রামাণিক পরিচয় এই ছবিগুলিতে বিধৃত।

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে আমরা প্রধানত এই সব শিল্পীরই জীবনধারা এবং শিল্পকৃতি অনুসরণ করব।

পাদটীকা ঃ

১. Morton : People's History of England
২. Archer : Indian Paintings for the British
৩. Sir William Foster's paper in the Journal of the Royal Societies of Art, May 1950
৪. W. H. Carey : The Good Old Days of Honourable John Company
৫. G. Reynolds : British Artists in India ; The Art of India and Pakistan, Ed. L. Ashton
৬. বিনয় ঘোষ : শিল্পনগর কলকাতা, সুন্দরম, বর্ষ ১, সংখ্যা ১, ১৩৬৩
৭. ঐ
৮. W. H. Carey : The Good Old Days of Honourable John Company.
৯. জোফানি (Zoffany) জাতিতে ইংরেজ না হলেও বহুদিন ইংলণ্ডে বসবাস করায় ইংরেজ বলেই গণ্য হতেন।
১০. Archer : Indian Paintings for the British

উইলিয়ম হজেস

ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকিয়েদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম ভারতভূমিতে পদার্পণ করেছিলেন তাঁর নাম উইলিয়ম হজেস।

লণ্ডনের এক দরিদ্র পরিবারে ১৭৪৪ সালে হজেসের জন্ম। বাবা ছিলেন কর্মকার। সেণ্ট জেমস মার্কেটে তাঁর ছোট একটা দোকান ছিল।

বালক-বয়সে শিপলির ছবি আঁকার ইস্কুলে ফুটফরমায়েস খাটার কাজ করতে করতে ছবি আঁকায় হাত মকসো করেছিলেন হজেস। ছবি আঁকায় তাঁর যে হাত আছে, এটা প্রথমে চোখে পড়ে শিল্পী রিচার্ড উইলসনের। বালক হজেসকে তিনি ছাত্র ও সহকারী হিসাবে গ্রহণ করেন।

উইলসনকে ছেড়ে এসে হজেস কিছুকাল লণ্ডনে ও ডার্বিতে থিয়েটারে সীন আঁকার কাজ করেছিলেন। ততদিনে শিল্পী হিসেবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছেন হজেস। ১৭৬৬ থেকে ১৭৭২ সালের মধ্যে 'সোসাইটি অব আর্টিস্ট-'এ তাঁর আঁকা ছবি প্রদর্শিতও হয়েছে কয়েকবার।

এই সময় কাপ্তেন কুক দ্বিতীয়বার দক্ষিণ সাগর অভিযানে বের হন। ড্রফটসম্যান হিসাবে হজেস কাপ্তেন কুকের সঙ্গী হয়েছিলেন। ১৭৭৫ সাল পর্যন্ত তিনি এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ফিরে আসার পরও কিছুকাল তাঁর চাকরির মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। অভিযানের যে-সব ছবি ইত্যাদির স্কেচ তিনি করেছিলেন, এই সময় হজেস তা শেষ করেন।

কাপ্তেন কুকের অভিযানের একটি সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হচ্ছিল, তার জন্যে ঐ ছবিগুলির এনগ্রেভিং-এর তদারকের ভারও ছিল হজেসের উপর। ১৭৭৬ সালে রয়েল আকাদেমিতে তাঁর ছবি প্রদর্শিত হয়।

কিন্তু ছবি এঁকে জীবিকা নির্বাহ করা ক্রমশ দুরূহ হয়ে উঠেছিল। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর হজেস ঠিক করলেন ভারতে গিয়ে একবার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখবেন। তখনকার দিনে ইংরেজদের ভারতে আসতে হলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনুমতি নিতে হতো। তদনুসারে আবেদনও করলেন হজেস। ১৭৭৮ সালের ২৮ অক্টোবর কোম্পানি হজেসের ভারতযাত্রার আবেদন মঞ্জুর করলেন।

যতদূর জানা যায় হজেস মাদ্রাজ এসে পৌঁচেছিলেন ১৭৮০ সালে। কিন্তু মাদ্রাজে ছবি আঁকার বিষয় খুঁজে না পেয়ে হজেস গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণের একটি পরিকল্পনা করেন। এই সময় হঠাৎ হায়দর আলি কর্ণাটক আক্রমণ করায় তাঁর সেই বাসনা অপূর্ণ থেকে যায়। যুদ্ধ থামবার কোনো সম্ভাবনা দেখতে না পেয়ে হজেস ১৭৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাঙলাদেশ অভিমুখে রওনা হন। এদেশে তাঁর স্বাস্থ্যও টিকছিল না। তাই মনে মনে ঠিক করেছিলেন, বাঙলাদেশ থেকে সোজা তিনি ফিরে যাবেন ইংলণ্ডে।

কিন্তু কলকাতায় কিছুদিন কাটিয়ে তাঁর স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি হলো। তাছাড়া এখানে এসে হজেস তৎকালীন অ্যাডভোকেট জেনারেল টমাস হেনরি ডেভিস ও ওয়ারেন হেস্টিংসের অকৃত্রিম স্নেহ

এবং সমর্থন লাভ করলেন। তাই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে হজেস থেকে গেলেন কলকাতায়।

সেই বছর এপ্রিল মাসে প্রথম ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে ভ্রমণের সুযোগ পেলেন হজেস। সে যাত্রায় মুর্শিদাবাদ হয়ে মুঙ্গের গিয়েছিলেন তিনি। মনের সুখে ছবি আঁকার সেই প্রথম সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেছিলেন হজেস।

অল্প কিছুদিন পরে কুখ্যাত বারাণসী অভিযানে যাত্রা করেন হেস্টিংস। হজেস সঙ্গী হয়েছিলেন হেস্টিংসের। বারাণসীতে গোলযোগ বাধবার পর হেস্টিংসের সঙ্গেই গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন চুনারে। আবার হেস্টিংসের সঙ্গেই ফিরে এসেছিলেন বারাণসীতে। বছরের শেষ দিকে সদলবল হেস্টিংস যান ভাগলপুরে। ভাগলপুরের অগাস্টাস ক্লিভল্যাণ্ডের সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছিল হজেসের। হেস্টিংসরা চলে যাবার পরও চার মাস ক্লিভল্যাণ্ডের কাছে থেকে যান হজেস। এই সময় গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে অনেকগুলি ছবি এঁকেছিলেন হজেস। ক্লিভল্যাণ্ড দরাজভাবে সাহায্য করেছিলেন তাঁকে। ক্লিভল্যাণ্ডের অকালমৃত্যুর পর কলকাতায় তাঁর ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নিলাম করে বিক্রি করার সময় দেখা যায় তার মধ্যে হজেসের ১১ খানা ছবি রয়েছে।

১৭৮২ সালের মে মাসের মাঝামাঝি হজেস কলকাতা ফিরে আসেন। ছবি আঁকা প্রায় বন্ধ থাকে। সেরে উঠতে উঠতে শীত পড়ে যায়। শীতকালে উত্তর ভারত ভ্রমণের একটা সুযোগ ঘটে। কোনো একটা দৌত্যকার্যে মেজর ব্রাউনকে পাঠানো হয়েছিল মোগল সম্রাটের প্রধানমন্ত্রী মীর্জা শফি খানের কাছে। হজেস মেজর ব্রাউনের দলভুক্ত হয়েছিলেন। হজেসের এক চিঠি থেকে জানা যায়, এজন্যে তাঁকে নাকি বেতনও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সরকারী নথিপত্রে এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়নি।

হজেস বারাণসী, এলাহাবাদ, কানপুর, লখনৌ হয়ে এটোয়া পৌঁছে

মেজর ব্রাউনের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। আগ্রার সন্নিকটে মির্জা শফি খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় মেজর ব্রাউনের। মেজর ব্রাউন যখন শফি খানের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন হজেস তখন পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে অনেক ছবি এঁকেছিলেন।

এবারেও দিল্লী যাবার কোনো সুযোগ হবে না বুঝতে পেরে এপ্রিলের শেষাশেষি ব্রাউনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হজেস গোয়ালিয়র অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখান থেকে লখনৌ, বারাণসী, বক্সার, ভাগলপুর হয়ে প্রায় সাড়ে নয় মাস পরে কলকাতা ফিরে আসেন। পথে সাসারামে শের শাহের সমাধির একটি সুন্দর স্কেচ করেছিলেন হজেস।

অতঃপর হজেস সুরাট অভিযানের সঙ্কল্প করেছিলেন—কিন্তু অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হওয়ায় তা কার্যে পরিণত করা যায়নি। ১৭৭৪ সালে হজেস দেশে ফিরে যান।

যাবার আগে গবর্নর জেনারেলের কাছে এক পত্রে হজেস কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ কোম্পানিকে তাঁর আঁকা কয়েকটা ছবি উপহার দেবার প্রস্তাব করেন। তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয়, কিন্তু শুল্ক ব্যাপারে কিছু গোলযোগের জন্যে ছবিগুলি কখনই ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসে টাঙানো হয়নি।

গুজব রটেছিল হজেস নাকি ভারতবর্ষ থেকে প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু এ-গুজব ভিত্তিহীন বলেই মনে হয়। শেষ জীবন তাঁর বেশ দারিদ্র্যের মধ্যেই কেটেছে। জীবিকার তাগিদে শেষ পর্যন্ত ছবি আঁকা ছেড়ে তাঁকে ব্যাঙ্কের ব্যবসায়ে নামতে হয়েছিল। কিন্তু এই ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে। অসম্মানের হাত থেকে বাঁচবার জন্য হজেস বিষপানে আত্মহত্যা করেন (৬ মার্চ, ১৭৯৭) বলে শোনা যায়। মৃত্যুর পর হজেসের ভ্রাতার আবেদনক্রমে হজেসের দুঃস্থ পরিবারের সাহায্যের জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁর কয়েকটি ছবি কিনেছিলেন।

হজেসের এই আর্থিক অসচ্ছলতার কারণ, তিনি পোর্ট্রেট আঁকায়

দক্ষ ছিলেন না, আর শিল্পকলার এই বিভাগটাই তখন ছিল সবচেয়ে অর্থকরী।

বিলেতে ফিরে এসে হজেস তাঁর স্কেচের ভিত্তিতে ভারতীয় দৃশ্যের এনগ্রেভিং চিত্রের দুটি সিরিজ প্রকাশের সংকল্প করেন। প্রতি সিরিজে ২৪ খানি করে রঙীন ছবি থাকবে আর তার সঙ্গে থাকবে ইংরেজি এবং ফরাসি ভাষায় ব্যাখ্যামূলক বর্ণনা। হজেস তাঁর এই অ্যালবামটি কোম্পানির ডিরেক্টরবর্গের উদ্দেশে উৎসর্গ করার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন। আবেদন মঞ্জুর হয়। কোম্পানি ৪০টি অ্যালবাম কিনবেন বলে জানান। ১৭৮৬ সালে 'সিলেক্ট ভিউজ ইন ইণ্ডিয়া' নামে এই অ্যালবামটি প্রকাশিত হয়।

এই স্কেচগুলির ভিত্তিতে হজেস ভারতীয় দৃশ্যের কিছু তৈলচিত্রও এঁকেছিলেন। ১৭৮৫ থেকে ১৭৮৮ সালের মধ্যে রয়েল আকাদেমিতে তাঁর যে-সব ছবি প্রদর্শিত হয় তার মধ্যে কম করে ২৪ খানা ভারতীয় চিত্র ছিল। ১৭৯৪ সালের প্রদর্শনীতে আরও চারখানা ভারতীয় ছবি স্থান পেয়েছিল।

১৭৮৬ সালে হজেস রয়েল আকাদেমির সহযোগী সদস্য নির্বাচিত হন এবং তিন বছর পরে পূর্ণ সদস্য হিসাবে গৃহীত হন।

১৭৯০ সাল নাগাদ হজেস ইওরোপ ভ্রমণে বের হন। এই সময় তিনি সেন্ট পিতার্সবার্গ (বর্তমান লেনিনগ্রাদ) গিয়েছিলেন। ফিরে এসে তিনি তাঁর ভারতভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করতে আরম্ভ করেন। ১৭৯৩ সালে 'ট্রাভল্‌স ইন ইণ্ডিয়া' নামে গ্রন্থাকারে তা প্রকাশিত হয়। পরে বইটি ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

এই সচিত্র ভ্রমণ কাহিনীটি নানা কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি বিবরণই বইটির পাতা জুড়ে থাকেনি—সেকালের ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সংস্থান- মানুষ-জন, আচার-ব্যবহারের একটি তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনাও এতে পাওয়া যায়। সঙ্গের ছবিগুলি এই বর্ণনাকে জীবন্ত করে তোলে। বইটি তাই সেকালের সামাজিক

ইতিহাস রচনার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস-গ্রন্থ।

একটি-দুটি নমুনা দিচ্ছি।

আঠারো শতকের শেষভাগে কলকাতার চেহারা কেমন ছিল, হজেসের বইয়ে তার নিম্নোক্ত বিবরণ পাওয়া যায়:

> "কলকাতা শহর ফোর্ট উইলিয়মের পশ্চিমবিন্দু হতে শুরু হয়ে নদীর পাড় ঘেঁষে প্রায় কাশীপুর গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। ইংরেজি মাইলের হিসেবে এই দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে চার মাইল। প্রস্থ কয়েক জায়গাতেই খুব কম। রাস্তাঘাট বেশ চওড়া। ফোর্টের এসপ্লানেডের দু'পাশের হর্ম্যমালা খুবই নয়নাভিরাম। প্রত্যেকটি গৃহ পরস্পর বিচ্ছিন্ন, চারপাশে ফাঁকা জায়গা দিয়ে ঘেরা। এতে বাড়িগুলির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানকার আবহাওয়া খুবই গরম তাই বাতাস চলাচলের প্রয়োজনে বাড়িগুলি খুব বড়ো করে তৈরী করা হয়। কয়েক সারি সিঁড়ি বেয়ে ঢুকতে হয় বাড়িতে। প্রশস্ত অলিন্দ ও স্তম্ভশ্রেণীশোভিত বাড়িগুলি দেখতে অনেকটা গ্রীক মন্দিরের মতো। মন্দিরই বটে, আতিথেয়তার মন্দির।..."

> "এই কলকাতা শহরে ইওরোপীয় ও এশিয়াটিক আচার-ব্যবহারের বিস্ময়কর সংমিশ্রণ দেখা যায়। কোচ গাড়ি, ফীটন একা, পাল্কী আর দেশীয়দের ছ্যাকড়া গাড়ি, হিন্দুদের পালাপার্বণ, ফকিরদের নানা রকম চেহারা—পৃথিবীর অন্য যে-কোনো দেশের চেয়ে অনেক বর্ণাঢ্য এই সব দৃশ্য।"

হজেস যখন এদেশে এসেছিলেন তখনও সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। 'ট্রাভলস্ ইন ইণ্ডিয়ায়' সতীদাহের সচিত্র বর্ণনা আছে।

১৭৪২-৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কাসিমবাজারের কাছে একটি সতীদাহের ঘটনা ঘটেছিল। মেয়েটি উচ্চবর্ণের। বয়েস সতেরো-

আঠারো। তিনটি ছেলেমেয়ের মা। বড়োটির বয়েস চার। ঘটনাটি ঘটেছিল, হজেসের ভারতে পদার্পণের অনেক আগে। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হজেস তার বইতে উদ্ধৃত করেছেন :

> "হতভাগিনীকে সবাই মিলে বোঝাল, ছেলেমেয়েদের তদারকের জন্য তার বেঁচে থাকা দরকার। মৃত্যুর যন্ত্রণার একটা মর্মস্পর্শী চিত্র আঁকা হলো। কিন্তু কিছুতেই কোনো ফল হলো না। মেয়েটি আগুনের মধ্যে একটি আঙুল ধরল এবং অনেকক্ষণ সেই অবস্থায় রইল। তারপর হাতের তালুতে আগুন নিয়ে তাতে ধূপধুনা দিয়ে ব্রাহ্মণদের আরতি করতে থাকল। মেয়েটির কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী তাকে বলল, তাকে সহমৃতা হবার অনুমতি দেওয়া হবে না। কথাটা শুনে মেয়েটির মনে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হলো। কয়েক মুহূর্তের চেষ্টায় নিজেকে সংযত করে মেয়েটি দৃঢ়কণ্ঠে বলল, মৃত্যু তার নিজের আয়ত্ত। জাতিপ্রথা অনুসারে তাকে সহমৃতা হতে না দিলে সে আমৃত্যু অনশন করবে। উপায়ন্তর না দেখে শুভানুধ্যায়ীদের মেয়েটির সেই ভয়ঙ্কর আত্মাহুতিতে সম্মতি দিতে হলো।"

পরে অবশ্য হজেস নিজেও একটি সতীদাহ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তার বর্ণনাও তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে আছে। কিন্তু তা উদ্ধৃত করতে গেলে পুনরুক্তি দোষ ঘটবে।

যে-সব অঞ্চলে হজেস ভ্রমণ করেছিলেন, সেই সব অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার বিবরণ এবং এই ধরনের টুকরো টুকরো সমাজচিত্র তাঁর অনতিবৃহৎ ভ্রমণকাহিনীটির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে।

জন জোফানি

সাল ১৭৮৩। খিদিরপুর ডকে একটি জাহাজ এসে ভিড়েছে। হঠাৎ শোরগোল পড়ে গেল : একজন নাবিক কোথায় হারিয়ে গেছে। খোঁজাখুঁজি বিস্তর হলো, কিন্তু হারানো নাবিকের সন্ধান আর পাওয়া গেল না।

নাবিক আসলে কিন্তু হারিয়ে যাননি। বন্দরে জাহাজ ভিড়তে সবার অলক্ষ্যে নেমে পড়ে কলকাতা শহরের জনারণ্যে মিশে গিয়েছিলেন। এই ফেরারী নাবিক আর কেউ নন, জার্মান শিল্পী জোফানি।

আঠারো শতকে যে-কজন বিদেশী শিল্পী এদেশে এসেছিলেন, জোফানি ছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান ও প্রতিভা-সম্পন্ন শিল্পী।

সেকালে ভারতবর্ষে আসতে হলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনুমতি নিতে হতো। অনেক তদ্বির-তদারক করে কোম্পানির কাছ থেকে ভারতে আসার অনুমতি পেয়েছিলেন জোফানি। কিন্তু শর্ত ছিল কোম্পানির জাহাজে যাত্রী হিসাবে স্থান পাবেন না তিনি। কি আর করেন, নাম ভাঁড়িয়ে ভারতগামী

জাহাজে নাবিকের চাকরি নিলেন। তারপর কলকাতা পৌঁছে জাহাজের ক্যাপ্টেনের চোখে ধুলো দিয়ে ফেরার হলেন।

ভারতবর্ষে সাত বছর ছিলেন জোফানি। প্রধানত পোর্ট্রেট আঁকিয়ে হলেও সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে এমন কয়েকটি তৈলচিত্রও তিনি এঁকেছিলেন, যার ঐতিহাসিক মূল্য তো আছেই সমাজতাত্ত্বিক মূল্যও কিছু কম নেই। কেন না সে-ছবিতে সেকালের মানুষের জীবন-যাত্রা ও পোশাক-আশাকেরও খানিকটা পরিচয় বিধৃত।

জন জোফানির নাম যদিও ইতালীয়দের মতো কিন্তু আদতে তিনি ছিলেন জার্মান। তাঁর জন্ম ১৭৩৩ সালে র‍্যাটিসবোন-এ। খুব ছেলে-বেলাতেই বাড়ি থেকে পালিয়ে তিনি চলে আসেন রোমে। শিল্পী হবার অদম্য আগ্রহ ছাড়া আর কিছুই সম্বল ছিল না তাঁর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর বাবার হস্তক্ষেপেই জনৈক কার্ডিনালের নজরে পড়েন তিনি এবং এক কনভেন্টে আশ্রয় পান। ইতালীতে তিনি বারো বছর ছিলেন এবং নানা শহর ঘুরে দেখেন। চিত্রকলায় তাঁর হাতেখড়ি এইখানেই। প্রায় দশ বছর এখানে তিনি ছবি আঁকার হাত মকসো করেন। বারো বছর পর জার্মানী ফিরে গিয়ে বিয়ে করেন জোফানি। কিন্তু এ বিয়ে সুখের হয়নি। জোফানি ইংলণ্ডে আসেন ১৭৫৮ সালে। এর পর থেকে ইংলণ্ডই হয় তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভূমি।

জোফানি ইংলণ্ডে এসেছিলেন ভাগ্যের সন্ধানে। কিন্তু ভাগ্যদেবীর করুণা সুলভ নয় বিশেষ করে জোফানির মতো সহায়-সম্বলহীন অজ্ঞাত-কুলশীল যুবকের পক্ষে। প্রথম দিকে তাই বেশ অর্থকষ্টেই পড়েছিলেন তিনি। ডারি লেনের এক অন্ধকার কুঠরিতে প্রায়-অনশনে দিন কাটছিল তাঁর। এই সময় বেল্লোভি নামে এক ইতালীয়ানের মধ্যস্থতায় স্টিফেন রিমবল্ট-এর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। রিমবল্ট ছিলেন ঘড়ি নির্মাতা। তাঁর কাছে ঘড়ির ডায়েল চিত্র করার কাজ পেলেন জোফানি। আপাতত জীবিকার সমস্যা মিটল বটে, কিন্তু এ-কাজ তাঁর মনঃপূত হলো না। অল্পকালের মধ্যেই বেঞ্জামিন উইলসন নামে একজন

শিল্পীর সহকারীর কাজ নিলেন।

কিন্তু এই কাজের একঘেয়েমি বেশিদিন সহ্য হলো না তাঁর। কাজ ছেড়ে দিয়ে নিজের দক্ষতার উপর নির্ভর করে জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন তিনি। টটেনহাম কোর্ট রোডে একটা বাড়ির উপর তলাটা ভাড়া নিয়ে স্টুডিও খুলে বসলেন। বাড়িওলা এবং তার স্ত্রীর দুখানা পোর্ট্রেট এঁকে দরজার দুপাশে স্থাপন করলেন—বিজ্ঞাপন হিসেবে। ঘটনাচক্রে সেকালের বিখ্যাত অভিনেতা গ্যারিক ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ছবি দুটি তাঁর চোখে পড়ল আর তা দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন চিত্রকর একজন শক্তিমান শিল্পী। গ্যারিক খুঁজে খুঁজে জোফানির সঙ্গে আলাপ করলেন।

গ্যারিক থিয়েটারকে জনপ্রিয় করার জন্য একটি পরিকল্পনা ভাঁজছিলেন। সেকালে এখনকার মতো পোস্টার বা স্টিল ছবির চলন হয়নি। গ্যারিক ঠিক করেছিলেন মঞ্চের নাট্যদৃশ্য অবলম্বনে ছবি আঁকিয়ে তা থেকে এনগ্রেভিং করে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন। গ্যারিক জোফানিকে এই কাজের ভার দিতে চাইলেন। জোফানি সানন্দেই গ্যারিকের প্রস্তাবে সম্মত হলেন।

কাজটা যদিও ছিল প্রায় বিজ্ঞাপন-শিল্পীর, তবু তারই মধ্যে জোফানির প্রতিভার ছাপ পড়ল। একটু একটু করে খ্যাতি পেতে লাগলেন তিনি। সেই সঙ্গে অর্থও। ফ্যাশনদুরস্ত মহলেও ডাক পড়ল তাঁর। সেই নাট্যদৃশ্যের একটি স্যার জোশুয়া রেনল্ডস্-এর এতই পছন্দ হলো যে তিনি একশ গিনি দিয়ে ছবিটি কিনলেন জোফানির কাছ থেকে। পরে আর্ল অফ কার্লিসলে ছবিটি স্যার জোশুয়ার কাছ থেকে কিনেছিলেন দেড়শ গিনি দিয়ে। শর্ত ছিল অতিরিক্ত পঞ্চাশ গিনি পাবেন জোফানি। এই সময় লর্ড বিউট-এর মধ্যস্থতায় রাজপরিবারের সঙ্গে পরিচিত হলেন জোফানি। রাজপরিবারে ছবি আঁকার কাজও পেলেন। ১৭৬৯ সালে বিলেতের বিখ্যাত রয়েল আকাদেমি অব আর্টস প্রতিষ্ঠিত হলো। জোফানি হলেন তার প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য।

জোফানি ছিলেন খেয়ালী মানুষ। কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ একদিন তিনি ঠিক করে ফেললেন ক্যাপ্তেন কুকের সমুদ্রযাত্রার সঙ্গী হবেন। কিন্তু তাঁর জন্য বরাদ্দ কেবিন দেখে তাঁর মনে হল এখানকার পরিবেশ ছবি আঁকার অনুকূল হবে না। তাই সমুদ্রযাত্রার সংকল্প তিনি ত্যাগ করলেন। জোফানির বদলে ক্যাপ্তেন কুকের সঙ্গী হয়েছিলেন হজেস।

অতঃপর জোফানি একবার ইতালী ঘুরে আসেন। এই যাত্রায় পাথেয় বাবদ ইংলণ্ডের রাজা তাঁকে দিয়েছিলেন ৩০০ পাউণ্ড এবং টসকানির গ্রাণ্ড ডিউকের কাছে একটি পরিচয় পত্র। ইতালীতে থাকা-কালীন ফ্লোরেন্স গ্যালারির একটি ছবি এঁকেছিলেন জোফানি। এই ছবিটির খুবই সমাদর হয়েছিল ইওরোপে। ইংলণ্ডের রাণী ছবিটি কিনেছিলেন ৬০০ গিনি দিয়ে।

কিন্তু যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করলে কি হবে, জোফানি ছিলেন অত্যন্ত খরচে লোক। টাকার অভাব তাই তাঁর কখনই ঘুচতো না। ভাগ্যের সন্ধানে তাই বিদেশ যাত্রার পরিকল্পনা করলেন জোফানি।

ইংরেজ শিল্পী টিলি কেট্‌ল ১৭৬৯ সালে ভারতযাত্রা করেছিলেন ভাগ্যান্বেষণে। ইতিমধ্যে তাঁর অভূতপূর্ব সাফল্যের সংবাদ পল্লবিত হয়ে বিলেতে পৌঁছুল। সাত বছর পরে রাজার সম্পত্তি করে দেশে ফিরলেন কেট্‌ল। বিয়ে করলেন। বাড়ি হাঁকালেন বণ্ড স্ট্রীটে। তাঁর এই সাফল্যে শিল্পী মহলে সাড়া পড়ে গেল। সকলেই ভারত যাবার সুযোগ খুঁজতে থাকলেন। শিল্পীদের ভারতযাত্রার হিড়িক শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছল ১৭৮০ থেকে ১৭৮৬ সালের মধ্যে। জোফানিও হুজুগে মাতলেন। কিন্তু কোম্পানি শিল্পীদের এই ভারত-অভিযান সুনজরে দেখত না। ভারতযাত্রার অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে ক্রমশ তাঁরা কড়াকড়ি করতে লাগলেন। জোফানিকে তাঁরা এমন শর্তে ভারতযাত্রার অনুমতি দিলেন যা অনুমতি না-দেবারই নামান্তর। কিন্তু কথায় আছে, ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। উপায় হলও। কোম্পানিকে

কলা দেখালেন জোফানি।

বিলেতে থাকবার সময়ই জোফানির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল, সুতরাং কলকাতায় এসে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে সময় লাগল না তাঁর। স্বয়ং গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস হলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক। কলকাতা এসে জোফানি প্রথম যে-কখানা ছবি আঁকলেন তার মধ্যে ছিল শ্রীমতী হেস্টিংসের (প্রাক্তন শ্রীমতী ইমহফ) একখানি প্রতিকৃতি।

১৭৮৪ সালে হেস্টিংস নিজে সঙ্গে করে নিয়ে লখনৌ-এ অযোধ্যার নবাব আশফ উদ্-দৌলার দরবারে জোফানিকে পরিচিত করে দেন। অচিরেই জোফানি নবাবের প্রিয়পাত্র হয়ে পড়েন।

এ-সম্পর্কে একটা মজার গল্প আছে। জোফানি নবাবের একটি কার্টুন চিত্র এঁকে বন্ধু ক্লদ মার্টিনকে দেখিয়েছিলেন। সেখানে আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিল। জোফানিকে অপদস্থ করার জন্য তাদের মধ্যে কে একজন নবাবের কাছে গিয়ে বলেন, জোফানি নবাবের একটা সুন্দর ছবি এঁকেছেন। নবাব অমনি জেদ ধরলেন ছবিটা তিনি দেখবেন। নবাবের সঙ্গে কর্ণেল জন মরডান্টের খুব দহরম মহরম ছিল। কথাটা তাঁর কানে যেতে তিনি জোফানিকে ব্যাপারটা জানালেন। প্রমাদ গণলেন জোফানি। তখনি রঙ-তুলি নিয়ে বসে গেলেন আবার। সারারাত জেগে ছবিটার ভোল ফিরিয়ে ফেললেন। পরদিন ছবিটা দেখে নবাব তো মহা খুশি। সুন্দর ছবি হয়েছে। তখুনি দশ হাজার টাকা ইনাম দিলেন জোফানিকে।

লখনৌ-এ থাকার সময় কয়েকটি ঐতিহাসিক ছবিও এঁকেছিলেন জোফানি। তার মধ্যে একটি ছিল মোগল সম্রাটের উত্তরাধিকারীর দরবারের দৃশ্য হেস্টিংস এবং নবাব আশফ উদ্-দৌলা এই দরবারে উপস্থিত ছিলেন। এ-ছাড়া নবাবের একাধিক প্রতিকৃতি এবং নবাবের প্রধানমন্ত্রী হাসান রেজা খাঁর একটি আলেখ্য রচনা করেছিলেন তিনি। তাঁর বিখ্যাত 'মোরগের লড়াই' ছবিটিও এই সময়ে আঁকা। জোফানি লখনৌ-এ ছিলেন তিন বছর।

জোফানি ভারতবর্ষে থাকার সময় পোর্ট্রেট ছাড়া আর যে-সব ছবি এঁকেছিলেন তার মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত ছবি হচ্ছে, 'হায়দারবেগের দৌত্য,' 'বাঘ শিকার' ইত্যাদি।

হায়দার বেগ হচ্ছেন নবাব আশফ উদ্-দৌলার উজির। ১৭৮৭ সালে তাঁকে কলকাতায় লর্ড কর্নওয়ালিসের কাছে পাঠানো হয়েছিল একটা বিশেষ কাজের ভার দিয়ে। লর্ড কর্নওয়ালিস নবাবের উপর বাৎসরিক কর ধার্য করেছিলেন ৭৪ লক্ষ টাকা। হায়দার বেগ কলকাতা এসেছিলেন এই টাকার অঙ্কটা কমাবার জন্য আলাপ-আলোচনা চালাতে। হায়দার বেগের দৌত্য সফল হয়েছিল। নবাবের দেয়-র পরিমাণ হ্রাস করে ৫০ লক্ষ টাকা ধার্য করেছিলেন কর্নওয়ালিস।

হায়দার বেগ তাঁর দলবল সহ কলকাতার পথে পাটনা এসে পৌঁছান। একটা হাতি এই সময় কি কারণে যেন খেপে ওঠে। ছবিতে সেই দৃশ্যটি ধরে রেখেছেন জোফানি। তিনি ওই দলের সঙ্গে ছিলেন। ছবির পটভূমিতে দেখা যাচ্ছে পাটনার বিখ্যাত ধর্মগোলা। দুর্দিনের জন্য সঞ্চয় করে রাখার উদ্দেশ্যে এটি স্থাপন করেছিলেন হেস্টিংস। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, মালবাহী একটা হাতি ক্রুদ্ধভাবে মাহুতকে শুঁড়ে জড়িয়ে ধরেছে। আরোহীদের ফেলে দিচ্ছে পিঠ থেকে। দলের লোকেরা ভয় পেয়ে ছুটোছুটি করছে। একটু পিছনে ঘোড়ায়-চাপা জোফানি ও তাঁর সঙ্গিদল। কিছু পথচারী, সব্জীওলা এবং মালবাহী কুলিও ছবিতে দৃশ্যমান।

জোফানি যে-সব ঐতিহাসিক ছবি এঁকেছিলেন তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটি তার বিষয়বস্তু : লর্ড কর্নওয়ালিস টিপু সুলতানের পুত্রকে জামিন হিসাবে গ্রহণ করছেন।

স্বাধীনচেতা টিপু সুলতান ইংরেজদের চক্ষুশূল ছিলেন। ১৭৯২ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ করেন। তুমুল যুদ্ধের পর প্রবল পরাক্রান্ত ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন

টিপু। সন্ধির শর্তের জামিন হিসাবে টিপুর দুই বালকপুত্রকে লর্ড কর্নওয়ালিসের হেফাজতে ছেড়ে দিতে হয়।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য টিপু এই অপমানজনক চুক্তি মানেননি। ১৭৯৯ সালে টিপুর সঙ্গে আবার লড়াই বাধে ইংরেজের। টিপু এবারে মৃত্যুপণ করে লড়াইয়ে নেমেছিলেন। টিপুর সেই গৌরবময় স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী ভারতের ইতিহাসে চিরকাল সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। শ্রীরঙ্গপত্তনে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিয়েছিলেন টিপু। অনেক কষ্টে মৃতদেহের স্তূপ থেকে টিপুর নশ্বর দেহাবশেষ উদ্ধার করা হয়েছিল।

জোফানির ছবিতে অবশ্য ঐতিহাসিক তথ্যের দিক থেকে একটু ভুল আছে। ছবিতে একটি পুত্রকে দেখানো হয়েছে। আসলে দুটি পুত্রকে জামিন রাখতে হয়েছিল টিপুর। ভুল হবার কারণ আছে। এই ঘটনাটি ঘটেছিল জোফানি ভারতবর্ষ থেকে চলে যাবার পর। ছবিটি তাঁর কল্পনাপ্রসূত। বিলেতে বসে তিনি এটি এঁকেছিলেন। হয়তো ভুল সংবাদ পেয়েছিলেন তিনি। তবে ছবিতে বর্ণিত কুশিলববৃন্দ ছিল জোফানির কাছে সুপরিচিত। সে দিক থেকে ছবিটি প্রামাণিক। ছবিটি বর্তমানে কলকাতার ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধে রক্ষিত আছে।

ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধে জোফানির আর একটি ছবি আছে, তাঁর নিজের আর তাঁর বন্ধুদের সম্পর্কে। এই ছবিটি থেকে সেকালের শ্বেতাঙ্গদের জীবনযাত্রার খানিকটা আঁচ পাওয়া যায়। বিলাসে-ব্যসনে ঢিলেঢালা জীবনযাত্রা নির্বাহ করত সেকালের ইংরেজরা। লোকে তাদের বলত খুদে নবাব। পরবর্তীকালে ডয়েলি এঁদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে কিছু ছবি এঁকেছিলেন। কিন্তু ডয়েলির অঙ্কনক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ যদিও তাঁর ক্ষেত্র ছিল অনেক ব্যাপক। জোফানির এই ছবিটির সেদিক থেকে বিশেষ একটা গুরুত্ব আছে, যদিও এটা তিনি কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আঁকেননি।

ছবিতে জোফানি নিজে ছাড়া আর আছেন কর্নেল অ্যান্টনি পোলিয়ের, জন উমবেল আর ক্লদ মার্টিন। জোফানি ছবি আঁকছেন।

এক সবজিওলার সঙ্গে দরদস্তুর করছেন কর্নেল পোলিয়ের। একজন ভারতীয় ভৃত্য একটি ছবি খুলে ধরে আছে, ক্লদ মার্টিন তা দেখছেন। মোটের উপর এই হচ্ছে ছবিটির বর্ণিত বিষয়।

জোফানির এইটে ছিল একটা রীতি। তাঁর আঁকা অনেক ছবিতেই তিনি নিজে উপস্থিত পেন্সিল হাতে কিংবা তুলি ও রঙের প্যালেট হাতে। বিলেতের রয়েল আকাদেমির ছত্রিশ জন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের নিয়ে যে ছবিটি তিনি এঁকেছিলেন তাতেও জোফানিকে দেখা যায় প্যালেট হাতে।

ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধে এ-ছাড়া আরও কয়েকখানি ছবি আছে জোফানির। কলকাতার সুপ্রাচীন সেন্ট জর্জ চার্চেও একটি ছবি আছে তাঁর। যীশু খ্রীস্টের শেষ ভোজের ছবি এটি।

কথিত আছে, এই ছবির জুডাসকে আঁকা হয়েছিল উইলিয়ম তুলো নামে সেকালের কলকাতার একজন নামজাদা নিলামকারীর মতো করে। জুডাস হচ্ছে সেই বিশ্বাসঘাতক, খ্রীস্টকে যে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। জুডাস খ্রীস্টানদের কাছে অতি ঘৃণিত চরিত্র। তুলোর সঙ্গে ঝগড়া ছিল জোফানির। তাই তাকে জুডাস হিসাবে এঁকেছিলেন জোফানি। তুলো নাকি জোফানির নামে এইজন্য মানহানির মামলা করেছিলেন। কিন্তু আদালতের নথিপত্র ঘেঁটে এই মামলার কোনো হদিশ করা যায়নি।

সে যাই হোক, জোফানির এই ছবিটি তার আঁকা শ্রেষ্ঠ ক্যানভাসের অন্যতম। চার্চ কমিটি ছবিটি পেয়ে এত খুশী হয়েছিলেন যে কলকাতা ত্যাগের প্রাক্কালে তাঁরা তাঁকে ৫০০০ টাকা মূল্যের একটি অঙ্গুরীয় উপহার দেবেন স্থির করেছিলেন। অর্থাভাবে শেষ পর্যন্ত এই সংকল্প রক্ষা করা যায়নি। তৎপরিবর্তে কমিটি তাঁকে একটি লিখিত প্রশংসাপত্র প্রেরণ করেন। এই প্রশংসাপত্রে কমিটি জোফানির শিল্পকৃতির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

জোফানি খুব তাড়াতাড়ি ছবি আঁকতেন বলে তাঁর কাজে কোনো গলদ থাকত না। সমসাময়িক একজন শিল্পী তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য

করেছিলেন, 'লোকটা রঙ-তুলি নিয়ে যা খুশি তা করতে পারে।' এমন নামডাক হয়েছিল জোফানির যে অন্যের আঁকা ছবিও তখন তাঁর নামে চলত। জোফানি পয়সাও করেছিলেন বিস্তর। ১৭৮৪ সালে কলকাতায় গুজব রটেছিল তিনি নাকি ঐ সময়ের মধ্যেই দশ হাজার পাউণ্ড জমিয়ে ফেলেছিলেন।

জোফানি ভারত ত্যাগ করেছিলেন ১৭৮৯ সালে। পথিমধ্যে জাহাজ ডুবে যায়। আর কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে লাইফ-বোটে আশ্রয় নেন জোফানি। তাদের সঙ্গে খাদ্য ছিল না। ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে সবাই। যাত্রীদের মধ্যে একজন ছিল রুগ্ন নাবিক। সে মারা যায়, কিংবা তাঁকে মেরে ফেলা হয়। যাত্রীরা শেষপর্যন্ত আদিম বর্বরের মতো তার মাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। এই দৃশ্য সারা জীবন ভুলতে পারেননি জোফানি। এমনিতে তিনি ছিলেন দিলখোলা পরিহাস-রসিক মানুষ। এই ঘটনা তাঁর জীবনে একটা বিষাদের ছায়া ফেলে। একেবারে অন্যমানুষ হয়ে যান জোফানি। এমনকি তার আঁকার ক্ষমতাও অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়।

ভারতবর্ষকে ভালো লেগেছিল জোফানির। শেষজীবনে আর একবার ভারতযাত্রার উদ্যোগ করেছিলেন তিনি। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠেনি। ১৮১০ সালে বিলেতে তাঁর মৃত্যু হয়।

টমাস ও উইলিয়ম ড্যানিয়েল

আঠেরো শতকে যে-সব ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকিয়ে ভারতে এসেছিলেন তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত নাম সম্ভবত টমাস ও উইলিয়ম ড্যানিয়েল। ব্যক্তিগত জীবন এঁরা ছিলেন খুড়ো-ভাইপো। এঁরা ভারতবর্ষে ছিলেন আট বছর। ছবি আঁকতে আঁকতে তাঁরা ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পরিভ্রমণ করেছিলেন। শিল্পসৃষ্টি হিসাবে এই সব ছবির মূল্য কতটা তা নিয়ে হয়তো মতবিরোধের অবকাশ আছে। অঙ্কন-দক্ষতা এবং 'পারসপেকটিভ' জ্ঞান অবশ্য ড্যানিয়েল খুড়ো-ভাইপোর (বিশেষ করে খুড়োর) ছিল। সাদৃশ্য বর্ণিকাভঙ্গ তাঁদের ছবিতে আছে, নেই ভাবলাবণ্য—ছবির যা প্রাণশক্তি। রঙের ব্যবহারে উজ্জ্বলতা নেই, তাঁদের ছবিতে ম্যাড়মেড়ে ধূসর সবুজ আর বাদামী রঙেরই প্রাবল্য। ফলত সে ছবিতে ভারতের প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিচিত্র বর্ণসমারোহ প্রায় অনুপস্থিত।

কিন্তু শিল্পসৃষ্টি হিসাবে ড্যানিয়েলদের ছবির মূল্য যাই হক না কেন, সেকালের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক সংস্থানের প্রামাণ্য চিত্র হিসাবে সেগুলির মূল্য অনস্বীকার্য।

ড্যানিয়েলরা পয়সা করতেই এদেশে এসেছিলেন—বিস্তর পয়সা করেওছিলেন। তবু তাঁদের ছবির বই, A Picturesque Voyage to India-র ভূমিকায় তাঁরা যখন লেখেন: 'বিজ্ঞানের আছে অ্যাডভেঞ্চার, দর্শনের কীর্তি। এশিয়ার তটভূমিতে অভিযান পরিচালনা করেছে ছাত্রের দল, জ্ঞান আহরণ ছাড়া যাদের নেই আর কোনো লালসা; এসেছে প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা যাদের নিষ্ঠুরতা স্পর্শ করে না কোনো মানুষকে; এসেছে দার্শনিকেরা যাদের একমাত্র কামনা ভ্রান্তি বিদূরণ ও সত্য প্রচার। এই নির্দোষ লুণ্ঠনে শিল্পীদেরই বা যোগ দিতে বাধা কি, বাধা কি এই সৌভাগ্যবতী ভূমি থেকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আহরণ করে ইওরোপে চালান দিতে।' —তখনও হয়তো তাঁরা ভাবের ঘরে চুরি করেননি। নইলে প্রাপ্তবয়স্ক ইংরেজের পক্ষে এদেশে এসে দুটো কাঁচা পয়সা রোজগার করার ঢের ঢের সহজ পথই তো তখন খোলা ছিল—তার যে-কোনো একটা তাঁরা বেছে নিতে পারতেন।

ড্যানিয়েলরা পয়সা করেছিলেন বটে কিন্তু প্রতিটি পয়সাই তাঁরা রোজগার করেছিলেন কঠিন পরিশ্রম করে।

টমাস ড্যানিয়েলের জন্ম ১৭৪৯ সালে কিংসটন-অন টেমস্-এ। তাঁর বাবা ছিলেন এক সরাইখানার মালিক। এই সরাইখানাটি সম্ভবত চার্টসি'র 'সোয়ান ইন'। 'সকল শিল্পীর বন্ধু' বলে পরিচিত ফ্যারিংটনের ডায়েরী থেকে জানা যায়, উইলিয়ম ড্যানিয়েলের মা ছিলেন এই 'সোয়ান ইন'-এর কর্ত্রী।

১৮১৩ সালে টমাস ড্যানিয়েল ফ্যারিংটনের কাছে নিজের জীবন-কাহিনী বিবৃত করেছিলেন। টমাস তখন খ্যাতিমান। রয়েল আকাদেমির সদস্য হয়েছেন, পয়সাও করেছেন বিস্তর। ফ্যারিংটন তাঁর ডায়েরীতে সে কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন: 'চোদ্দ বছর বয়সে তিনি লণ্ডন আসেন। ওখানে তিনি ম্যাকসওয়েল নামে কোচ রঙ-করিয়ের শিক্ষানবীশ নিযুক্ত হন। সাত বছর এ-কাজ করেন। পরে কয়েক বছর ক্যাটন নামে জনৈক ব্যক্তির অধীনে কোচ রঙ করার চাকুরি

করেন। তিরিশ বছর বয়েসের আগে ভালো করে ছবি আঁকার মনোনিবেশ করতে পারেননি তিনি।'

পুরনো দিনের জীবন-সংগ্রামের কাহিনী স্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে টমাস ড্যানিয়েল সত্যের উপর কিছু রঙ চাপিয়েছেন মনে হয়। বস্তুতপক্ষে তিনি রয়েল আকাদেমির স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন ১৭৭২ সালে, চার্টসির কবি কাউলির ছবি এঁকে কিছু নাকি সুনামও করেছিলেন। এই পর্যায়ের দু'খানি ছবি ১৭৭৭ সালে রয়েল আকাদেমিতে প্রদর্শিতও হয়। তারপর থেকে ১৭৮৪ সাল পর্যন্ত নিয়মিত তাঁর ছবি রয়েল আকাদেমিতে প্রদর্শিত হয়েছে।

ড্যানিয়েলরা ভারতে আসেন ১৭৮৬ সালে। সেকালে কোনো ব্রিটিশ প্রজাকে ভারতে আসতে হলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে অনুমতি নিতে হত। শিল্পীদের এদেশে আসা কোম্পানি সুনজরে দেখতে না—তাই অনুমতি পাওয়া কঠিন ছিল। ১৭৮৩ সালে জোফানি এবং চার্লস স্মিথকে কোম্পানি এই শর্তে ভারতে আসার অনুমতি দিয়েছিল যে তাঁরা কোম্পানির জাহাজে স্থান পাবেন না। জোফানি এক জাহাজে চাকরি জুটিয়ে কোম্পানিকে ফাঁকি দিয়েছিলেন। ড্যানিয়েলরা ভাগ্যবান, তাঁদের এমনি ধারা কোনো অসুবিধায় পড়তে হয়নি।

১৭৮৪ সালের ১ ডিসেম্বর টমাস ড্যানিয়েল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছে থেকে এনগ্রেভার হিসাবে ভারতে আসার অনুমতি সংগ্রহ করেন। কয়েক দিন পরে ভ্রাতুষ্পুত্র উইলিয়মও সঙ্গে যাবার অনুমতি পান।

উইলিয়ম ড্যানিয়েলের জন্ম ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। ভারতে যখন আসেন, তখন তাঁর বয়স ছিল পনেরো বছর।

পরের বছর, অর্থাৎ ১৭৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে (১ ফেব্রুয়ারি) রবার্ট স্মারকে ও এডমণ্ড হেগ জামিন দাঁড়ানোয় ড্যানিয়েলরা কোম্পানির জাহাজেই দেশত্যাগের অনুমতি পান। ১৭৮৫ সালের ৭ এপ্রিল খুড়ো-ভাইপো 'অ্যাটলাস' জাহাজযোগে ভারত অভিমুখে রওনা হন।

ড্যানিয়েলরা ভারতবর্ষে এসেছিলেন চীন দেশ ঘুরে। প্রথমে তাঁরা যান ক্যান্টনে। হোয়ামপোয়া পৌঁছান ১৭৮৬ সালের গোড়ার দিকে।

উইলিয়ম হজেস ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকতেন। মাত্র তিন বছর এদেশে কাটিয়ে তিনি প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করেছিলেন। প্রধানত তাঁর সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়েই ড্যানিয়েলরা এদেশে আসার সংকল্প করেছিলেন।

১৭৮৪ সালে টমাস ড্যানিয়েল যখন ভারত-যাত্রার সিদ্ধান্ত করেন, জোফানি তখন লখনৌ-এ। অযোধ্যার নবাব আশফ-উদ্-দৌলা তখন ইওরোপায় শিল্পীদের পেট্রন হিসাবে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছেন। ১৭৮৪ সালে কলকাতায় ওজিয়াস হমফ্রি গুজব শুনেছিলেন যে, জোফানি ইতিমধ্যেই প্রায় ১০ হাজার পাউণ্ড জমিয়ে ফেলেছেন। জোফানি কলকাতায় কর্নেল ক্লদ মার্টিনের সঙ্গে থাকতেন। কর্নেল মার্টিনের সঙ্গে ড্যানিয়েলের যোগাযোগ ছিল। তাঁর কাছ থেকেই সম্ভবত জোফানির বৈষয়িক সাফল্যের খবরও টমাস ড্যানিয়েল পেয়েছিলেন।

টমাস ড্যানিয়েলের মনে আশা ছিল, হজেসের মতো কিংবা তাঁর থেকেও বেশী অর্থ তিনি উপার্জন করতে পারবেন। 'অ্যাকোয়াটিণ্ট'-এর এক নতুন পদ্ধতিতে তিনি যেরূপ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন, তাতে তাঁর এই আশাকে দুরাশাও বলা যায় না।

ড্যানিয়েলরা ছিলেন অক্লান্ত কর্মী। কলকাতা পৌঁছেই তাঁরা কাজ শুরু করে দেন। ১৭৮৬ সালের ১৭ জুলাই তাঁরা এই মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন যে, বারোটি কলকাতা-দৃশ্যের একটি সেট তাঁরা প্রকাশ করবেন। যাঁরা অগ্রিম গ্রাহক হবেন, তাঁরা সেটটি পাবেন ১২ স্বর্ণ-মোহর দামে। টমাস হিকি তখন কলকাতায় ছিলেন। এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারে হিকি ড্যানিয়েলদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

কলকাতা-দৃশ্যের প্রথম ছ'টি শেষ হয়েছিল পরের বছর মে মাসে এবং বাকী ছ'টি ১৭৮৮ সালে।

কলকাতা থাকাকালে আরও অনেক খুচরো কাজ করেছেন খুড়ো-ভাইপো। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর স্থলে গবর্নর জেনারেল নিযুক্ত হয়ে

লর্ড কর্নওয়ালিস বাঙলা দেশে আসেন ১৭৮৬ সনে। এতদুপলক্ষে কাউনসিল-ঘর সংস্কার করানো হয় এবং ওল্ড কোর্ট হাউস থেকে সরিয়ে আনা ছবি দিয়ে ঘরটি সাজানো হয়। এই কাজের ভার পেয়েছিলেন ড্যানিয়েলরা। এই জন্যে ১,৫০০ 'সিক্কা' টাকা দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল তাঁদের।

ড্যানিয়েলরা উত্তর ভারত পরিক্রমায় বের হয়েছিলেন ১৭৮৮ সনের অগস্ট মাসে। কলকাতা থেকে তাঁরা গিয়েছিলেন হরিদ্বার পর্যন্ত। হরিদ্বার থেকে লালডঙ্ হয়ে নেজিয়াবাদ এসেছিলেন। সেখান থেকে যান গাড়োয়াল। গাড়োয়ালের রাজা তাঁদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর রাজধানী শ্রীনগরে। রাজা নিজে এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে। উইলিয়ম ড্যানিয়েলের ডায়েরি থেকে জানা যায় শ্রীনগরে তাঁরাই ছিলেন প্রথম বিদেশী পর্যটক।

শুধু শ্রীনগর কেন, উত্তর ভারত পরিক্রমায় তাঁরা এমন অনেক জায়গায় গিয়েছেন যেখানে নাকি তার আগে অপর কোনো বিদেশী পদার্পণ করেননি। ১৭৮৯ সালের ৯ জুলাই সংখ্যা 'ক্যালকাটা গেজেট'-এ প্রকাশিত এক পত্রে ফতেগড় প্রবাসী জনৈক ইংরেজ লিখেছেন : 'গাঁয়ের লোকেরা চোখ বড় বড় করে তাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকত—যেন তাঁরা কোনো অপ্রাকৃত জীব। বিশেষ করে তারা তাঁদের জামা-কাপড় এবং অঙ্গস্পর্শ করে দেখবার জন্য ব্যগ্র ছিল।'[১]

উইলিয়ম ড্যানিয়েল ভারত পরিক্রমার একটি ডায়েরী রেখে-ছিলেন। পরবর্তী কালে তাঁদের কিছু চিঠিপত্রও আবিষ্কৃত হয়েছে। এ থেকে তাঁদের ভারত-পরিক্রমার এবং সেকালের জীবনযাত্রার একটি কৌতূহলোদ্দীপক চিত্র পাওয়া যায়। এখানে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেবার স্থান নেই।

প্রায় দুই বৎসরকাল উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করে ১৭৯১ সালে—তাঁরা কলকাতা ফিরে আসেন। ভাগলপুর, মুঙ্গের পাটনা, এলাহাবাদ, কানপুর, ফতেগড়, ফিরোজাবাদ, মথুরা, বৃন্দাবন, আগ্রা, দিল্লি, লখনৌ

প্রভৃতি উত্তর ভারতের প্রায় সব কটি প্রধান শহরেই তাঁরা গিয়েছিলেন।

কলকাতায় ফিরে এসে ড্যানিয়েলরা আবার সুন্দরবন পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন। উত্তর ভারত পরিক্রমায় গিয়ে তাঁরা যে-সব স্কেচ এঁকেছিলেন, এইবার তা থেকে কয়েকটি তৈলচিত্র আঁকলেন তাঁরা। কলকাতায় ওল্ড হারমনিক ট্যাভার্নে ড্যানিয়েলরা একটি চিত্র প্রদর্শনী করেন। তাতে কমপক্ষে ১৫০টি ছবি স্থান পেয়েছিল।

১৭৯২ সালের ৫ জানুয়ারি সংখ্যা 'ক্যালকাটা গেজেট'-এ লটারী করে তাঁদের ছবিগুলি বিক্রী করা সম্পর্কে ড্যানিয়েলদের একটি প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। লটারী অনুষ্ঠিত হয় ১ মার্চ। আর্থিক দিক থেকে এই লটারীর ফল নাকি খুবই 'সন্তোষজনক' হয়েছিল।

ড্যানিয়েলরা দক্ষিণ ভারত সফরে বের হয়েছিলেন ১৭৯২ সালের ১০ মার্চ। এই সময় তাঁরা মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, কাঞ্জিভরম, আরকট, ভেলোর, কোলার, মাদুরা, ত্রিচিনোপল্লী, তাঞ্জোর প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন। এই সময় তাঁরা সিংহলেও গিয়েছিলেন। মাদ্রাজেও তাঁরা লটারী করে ছবি বিক্রী করেছিলেন। ড্যানিয়েলরা বোম্বাই অঞ্চল পরিক্রমায় বের হন ১৭৯৩ সনের জুন মাসে। বোম্বাই থেকেই তাঁরা সম্ভবত দেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

সে সময় যানবাহনের সুবিধা ছিল না। অধিকাংশ পথই তাঁরা নৌকাযোগে বা পালকিতে কিংবা পদব্রজে ভ্রমণ করেছেন। পথের হিসাব রাখবার জন্য অদ্ভুত একটা যন্ত্র ব্যবহার করতেন তাঁরা। দেখতে এটা প্যারাম্বুলেটারের মতো। এর চাকার সঙ্গে স্প্রিং এবং কাঁটা যোগ করা ছিল। হাতল দিয়ে যন্ত্রটি ঠেলে নিয়ে গেলেই একটি ডায়ালের গায়ে মাইলের হিসাব চিহ্নিত হয়ে যেত।

ড্যানিয়েলরা অক্লান্ত কর্মী ছিলেন। ছবি আঁকার বিরাম ছিল না তাঁদের। বৃষ্টির দিন বা সন্ধ্যায়ও তাঁরা ছুটি নিতেন না। এই সময়টা তাঁরা পুরনো ছবি 'ওয়াশ' করতেন বা তার ওপর রঙ চড়াতেন। কত

যে পেনসিল ব্যবহার করেছেন তাঁরা তার ঠিক নেই। এক ফতেগড় থেকে মথুরাতেই পাঁচ ডজন পেনসিল পাঠানো হয়েছিল তাঁদের কাছে।

ছবি আঁকার জন্য একটা যন্ত্র ব্যবহার করতেন তাঁরা। এর নাম 'ক্যামেরা অবস্‌কিউরা'। অনেকটা বক্স ক্যামেরার মতো দেখতে এটি। ক্যামেরার মতই যন্ত্রটির 'বেলো'র ওপর লেন্স বসানো থাকত। নির্বাচিত দৃশ্যটি আয়না মারফত লেন্সের মধ্য দিয়ে গিয়ে প্রতিফলিত হত সাদা কাগজের ওপর। শিল্পী ফোটোগ্রাফারের মতো কালো পর্দার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে নির্বাচিত দৃশ্যের প্রান্তরেখাটি পেনসিল দিয়ে সাদা কাগজের ওপর এঁকে নিতেন। তারপর ছবিটি পুরো এঁকে নিয়ে তাঁর ওপর রঙ চড়াতেন।

ড্যানিয়েলদের অঙ্কন এমন নিখুঁত ছিল যে, বাংলা সরকার রোটাস দুর্গের ভগ্ন মন্দিরটি পুনর্নির্মাণের জন্য তাঁদের ছবিকেই মডেল হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন।[২]

আজকালকার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করতে গেলে তাঁদের ছবিতে উঁচুদরের শিল্পনৈপুণ্যের অভাবই হয়ত চোখে পড়বে। কিন্তু সেকালে তাঁদের ছবিগুলি খুবই সমাদৃত হয়েছিল এবং প্রায় তিরিশ বছর ধরে এর চাহিদা অক্ষুণ্ণ ছিল।

ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করে তাঁরা যে সব ছবি ও স্কেচ করেছিলেন, সেগুলি থেকে এনগ্রেভিং করে তাঁরা Views of Calcutta (১৭৮৬-৮৮), ছয় খণ্ডে সমাপ্ত Oriental Scenary (১৭৯৫-১৮০৮), A Picturesque Voyage in India (১৮১০) এবং কন্টারের (Caunter) সহযোগিতায় The Oriental Annual (১৮৩৪-৪০) প্রকাশ করেছিলেন। এর প্রত্যেকটির জন্য খুব উচ্চমূল্য ধার্য করা হয়েছিল। ভারতবর্ষে চব্বিশখানি ছবির দাম পড়ত ২০০ 'সিক্কা' টাকা আর বিলেতে Oriental Scenary বিক্রী হত ২১০ পাউণ্ডে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তখন এগুলির ক্রেতার অভাব হয়নি। সেকালে এ-সব ছবি যে কতটা সমাদৃত হত, শ্রীমতী এম্মা রবার্টসের

লেখা থেকে তার খানিকটা পরিচয় পাওয়া যাবে।৩ শ্রীমতী রবার্টস লিখেছেন: 'মিঃ ড্যানিয়েল এমন একজন শিল্পী যিনি দীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষের প্রকৃতির বিস্ময়কর শোভা এবং ভারতের কলা-সম্পদকে রূপায়িত করতে সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর অঙ্কন আশ্চর্য রকমের বিশ্বস্ত...'৩

যাই হোক, আর্থিক দিক দিয়ে ড্যানিয়েলদের ভারত-অভিযান সাফল্যমণ্ডিতই হয়েছিল। ইংলণ্ডে ফিরে তাঁরা সুখে-স্বচ্ছন্দেই দিন কাটিয়েছেন। উইলিয়ম ড্যানিয়েলের নিজের উক্তি থেকেই জানা যায় যে, তাঁর বাৎসরিক আয় ছিল ১,২০০ থেকে, ১,৪০০ পাউণ্ড আর খরচ ৭০০ থেকে ৮০০ পাউণ্ড। এই আয়ের মোটা অংশটিই আসত ভারতে আঁকা ছবি থেকে। স্মারকে লিখেছেন, বিদেশ থেকে ভারত-দৃশ্যের আঠারোটি সেটের অর্ডার পেয়েছিলেন টমাস ড্যানিয়েল। এ-থেকে তাঁর আয় হবে ২,০০০ পাউণ্ডের বেশী।

টমাস ড্যানিয়েল রয়েল আকাদেমির সহযোগী সদস্য নির্বাচিত হন ১৭৯৬ সালে এবং পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করেন ১৭৯৯ সালে। প্রধানত টমাস ড্যানিয়েলের চেষ্টাতেই উইলিয়ম ড্যানিয়েল আকাদেমির সহযোগী সদস্য হন ১৮০৮ সালে এবং পূর্ণ সদস্যপদ পান ১৮২২-এ। উইলিয়ম ড্যানিয়েলের এই সম্মান-প্রাপ্তি নিয়ে সেকালে অনেক বিরূপ সমালোচনা হয়েছিল।

ড্যানিয়েলদের ছবি কিছু আছে লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া অফিসে, কিছু রয়েল জিওগ্রাফিকাল সোসাইটিতে আর কিছু রয়েল আকাদেমির ডিপ্লোমা গ্যালারিতে। বর্ধমানের মহারাজাধিরাজের সংগ্রহে এঁদের অনেকগুলি তৈলচিত্র ছিল। তার কিছু তিনি দান করেছেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চিত্রশালায়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চিত্রশালায় ড্যানিয়েলদের সাতচল্লিশটি তৈলচিত্র রক্ষিত আছে।

---

১. Bengal Past and Present Vol. XXV

২. Bengal Past and Present, Vol. XXXVII

৩. E. Roberts : Scenes and Characteristics of Hindustan with sketches of Anglo-Indian Society.

র বা র্ট হো ম

কানপুর কাছারি সমাধি-ক্ষেত্রে প্রবেশ পথের বাঁ দিকে পড়বে একটি সমাধি, অতি সাদাসিধে ধরনের যাতে ডিম্বাকৃতি একটি কালো পাথরের ফলকের উপর লেখা আছে

'রবার্ট হোম, মৃত্যু ১২ সেপ্টেম্বর, ১৮৩৪, বয়স ৮২।'

রবার্ট হোমের আঁকা যত ছবি ভারতের বিভিন্ন স্থানে আছে, আঠারো-উনিশ শতকে আগত আর কোনো ইংরেজ শিল্পীর তত ছবি বোধ হয় এদেশে নেই। ইভান কটন লিখেছেন, পার্ক স্ট্রীটের এশিয়াটিক সোসাইটির বিভিন্ন হলেই কমপক্ষে আছে তাঁর আঁকা ২৫ খানা ছবি। এছাড়াও তাঁর আঁকা পোট্রেট ছিল দিল্লি, সিমলা ও বেলভেডিয়ারের ভাইসরয়ের প্রাসাদে, কলকাতার গবর্নর হাউসে, মাদ্রাজের ব্যাঙ্কুয়েট হলে, কলকাতার টাউন হলে, হাইকোর্ট এবং ভিক্টোরিয়া স্মৃতি সৌধে।

রবার্ট হোম ছিলেন লণ্ডনের লোক। তাঁর বাবা রবার্ট বায়ার্ন হোম ছিলেন সেনাবাহিনীর ডাক্তার আর মা মেরি হাচিনসন ছিলেন সেণ্ট হেলেনার গবর্ণর কর্নেল হাচিনসনের কন্যা।

যেহেতু ১৮৩৪ সালে ৮২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু তাই ধরে

নেওয়া যেতে পারে তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৭৫২ সালে। চিত্রকলায় তাঁর হাতেখড়ি অ্যাঞ্জেলিকা কাউফম্যানের কাছে। যে দু'একজন মহিলা-শিল্পী সেকালে রয়াল আকাদেমির সদস্যা হয়েছিলেন অ্যাঞ্জেলিকা কাউফম্যান ছিলেন তার অন্যতমা। রবার্ট হোম রোমেও কিছুকাল চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন।

রয়েল আকাদেমিতে তাঁর ছবি প্রথমে প্রদর্শিত হয় ১৭৭০ সালে। ১৭৭৮ সালে তিনি ডাবলিন গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। ১৭৮০ সালে ডাবলিনে তাঁর একটি প্রদর্শনী হয়। এখানে প্রদর্শিত হয়েছিল ২২টি ছবি। পরের বছর রয়েল আকাদেমিতে তিনি দুখানা ছবি পাঠান। তার মধ্যে একটি—'জনৈক শিল্পীর প্রতিকৃতি' সম্ভবত তাঁর নিজের প্রতিকৃতি।

রবার্ট হোম সম্ভবত মাদ্রাজ এসে পৌঁচেছিলেন ১৭৯০ সালে। উইলিয়ম হিকি ১৭৯১ সালে মাদ্রাজে এসে হোম-এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, যদিও এই প্রথম দর্শন খুব প্রীতিকর হয়নি। হিকি এসে উঠেছিলেন হিউ মেকলে বয়েডের বাড়িতে। একদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে ডাইনিং হলে উঁকি মেরে দেখেন শিল্পী হোম এবং আরও প্রায় জন ছয়েক একেবারে বেহেড মাতাল অবস্থায় সেখানে বিরাজ করছেন। এমনই বেসামাল তাদের অবস্থা যে কারোর পক্ষে একলা দাঁড়ানো সম্ভব ছিল না। টেবিলকে ঘিরে তারা নাচছিলেন, বা বলা উচিত টলছিলেন আর তারস্বরে একটা গানের কলি গাইছিলেন, অবশ্য বেতালা চিৎকারকে যদি গান বলা যায়। কিন্তু তাই বলে তিনি যে তাঁর মাদ্রাজের দিনগুলি হাল্লাগুল্লা করেই কাটিয়েছেন তা নয়। লর্ড কর্নওয়ালিসের যে প্রতিকৃতিটি মাদ্রাজের ব্যাঙ্কুয়েটিং হলে শোভা পেত তা হোম সম্ভবত এঁকেছিলেন ১৭৯২ সালে শ্রীরঙ্গপত্তনে কিংবা মাদ্রাজে। টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে প্রথমে যে অভিযান পরিচালিত হয়েছিল হোম তার সঙ্গী হয়েছিলেন। এই অভিযানেরই শৈল্পিক ফসল হল, 'সিলেক্ট ভিউজ ইন মাইশোর, দ কান্ট্রি অব টিপু সুলতান'—টিপু সুলতানের দেশ

মহীশূরের নির্বাচিত দৃশ্যাবলী। এই অ্যালবামটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৯৪ সালে।

১৭৯৬ সালে হোম 'ভিউজ অব শ্রীরঙ্গপত্তন, দ ক্যাপিটাল অব টিপু সুলতান'—টিপু সুলতানের রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনের দৃশ্য নামে ছ'টি রঙীন ছবি প্রকাশ করেন। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে কর্নওয়ালিসের যে প্রতিকৃতিটি—তাও এই সময়ই অঙ্কিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। হোম-এর পুত্ররা ১৮৩৪ সালে এই প্রতিকৃতিটি এশিয়াটিক সোসাইটিকে অর্পণ করেন।

টমাস এবং উইলিয়ম ড্যানিয়েলের যে প্রতিকৃতিটি এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে তাও মাদ্রাজেই অঙ্কিত হয়েছিল।

হোম কলকাতা এসেছিলেন ১৭৯২ সালে। 'ক্যালকাটা গেজেট'-এর ১৮ অক্টোবর সংখ্যায় ঘোষণা করা হয় 'যাঁর আঁকা লর্ড কর্নওয়ালিস-এর প্রতিকৃতি এবং মহীশূরের দৃশ্যাবলী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সেই মিঃ হোম মাদ্রাজ থেকে শীঘ্র কলকাতা আসছেন।' তাঁর কলকাতা এসে পৌঁছাবার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল পরবর্তী কোনো সংখ্যায়।

এশিয়াটিক সোসাইটিতে যে-সব চিত্র রক্ষিত আছে তার যে বর্ণনামূলক ক্যাটলগ তৈরি করেছিলেন ড. সি. আর. উইলসন তাতে বলা হয়; ১৭৯২ সালের শেষের দিকে হোম কলকাতা আসেন এবং এসেই বেশ ভালো রকম পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে যান। তাসত্ত্বেও তিনি কিন্তু প্রথমটা লখনৌ চলে যান আসফ উদ্-দৌলার দরাজ দিলের আকর্ষণে। নবাব তাঁকে নিযুক্ত করেন তাঁর ঐতিহাসিক এবং প্রতিকৃতি শিল্পী হিসেবে। এখানে অল্প সময়ের মধ্যে হোম প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু নবাব ছিলেন অত্যন্ত খামখেয়ালি প্রকৃতির লোক, কোনো সভাসদের উপর কোনো কারণে বিরক্ত হলে অমনি শিল্পীর ডাক পড়তো ছবি থেকে তাকে বাদ দেবার জন্য, যদিও হয়তো স্কেচ ততক্ষণে পুরো আঁকা হয়ে গেছে। এসব কারণেই নাকি

হোম শেষ পর্যন্ত কানপুর চলে যান।

স্যার ইভান অবশ্য মনে করেন কেরির সাক্ষ্যনির্ভর এই বর্ণনায় কিছু ভুল আছে। ১৭৯৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত হোম নিশ্চয়ই মাদ্রাজ ছিলেন। ঐ সময় মাদ্রাজে লর্ড কর্নওয়ালিস একটা পার্টি দিয়েছিলেন হোম তাতে উপস্থিত ছিলেন। অবশ্য এমনটাও হ'তে পারে যে ১৭৯৩ সালের শেষের দিক থেকে ১৭৯৫ সালের মে মাস পর্যন্ত হোম লখনৌতেই ছিলেন। কিন্তু মাদ্রাজ তিনি নিশ্চয়ই ফিরে গিয়েছিলেন। ৩০ মে, ১৭৯৫ সংখ্যা 'মাদ্রাজ কুরিয়ার' থেকে জানা যায় 'গত মঙ্গলবার মিঃ হোম আনা জাহাজ যোগে কলকাতা রওয়ানা হয়ে গেছেন এবং সেখানে গিয়ে নিশ্চয় উপযুক্ত সংবর্ধনা পাবেন। মানুষ হিসেবে তাঁর চরিত্র এবং শিল্পী হিসেবে তাঁর প্রতিভা নিশ্চয়ই এটা দাবি করতে পারে।' আনা জাহাজ রওয়ানা হয়েছিল ২৮ মে এবং হুগলী নদীতে এসে পৌঁচেছিল ৪ জুন। ডানিয়েল-খুড়ো ভাইপো মাদ্রাজেই থেকে গিয়েছিলেন ছবি বিক্রি করার ধান্দায়।

১৭৯৫ সালের ২২ মে, অর্থাৎ কলকাতা যাত্রার মাত্র কয়েকদিন আগে হোম একটি কার্ড প্রকাশ করেছিলেন। এটি ৬ জুনের 'মাদ্রাজ কুরিয়ারে' প্রকাশিত হয়েছিল। এতে লেখা ছিল :

মিঃ হোম এই সুযোগে সবাইকে জানাচ্ছেন যে তিনি স্যার আয়ার কুটের প্রতিকৃতি সম্পূর্ণ শেষ করেছেন এবং সেটি এখন 'একসচেঞ্জ রুমে' টাঙানো হয়েছে। তাই তিনি সকলকে এই অনুরোধ করার অনুমতি চাইছেন যে, যেসব ভদ্রলোক তাদের দেয় চাঁদা এখনও দেননি, বা যাঁরা চাঁদার অঙ্কে আরও কিছু যোগ করতে চান তাঁরা যেন অতি-সত্বর তা মেসার্স ডুলো, জাভিস অ্যাণ্ড এজেন্সী-তে জমা দেন।

এরপর মিঃ হোম সম্পর্কে যে খবর পাওয়া যায় তা নিতান্তই গার্হস্থ্য ব্যাপার। 'ক্যালকাটা গেজেট' বৃহস্পতিবার ১৭ সেপ্টেম্বর ১৭৯৫, খবর দেয় রবিবার সন্ধ্যায় মিঃ কলভিনের বাড়িতে মিস এ প্যাটারসনের সঙ্গে মিঃ রবার্ট হোমের শুভ পরিণয় অনুষ্ঠিত হবে।

শুভ কার্য সম্পন্ন করবেন রেভারেণ্ড মিঃ ব্ল্যানচার্ড। বিলেতের ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত কাগজপত্র থেকে জানা যায় পাত্রীর খ্রীস্টান নাম ছিল অ্যানা অ্যালিসিয়া।

যতদূর জানা যায় বিয়ের পর হোম লখনৌ চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু আশফ উদ্-দৌলার মৃত্যুর পর আবার কলকাতা ফিরে আসেন। ১৭৯৭ সালের ১৭ অগস্ট তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন এবং সংস্থার সম্পাদক নিযুক্ত হন ১৮০২ সালের ৬ মার্চ। ঐ পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন ১৮০৪ সালের ৪ এপ্রিল পর্যন্ত। পরে তিনি পদত্যাগ করেন। কিন্তু তারপরেও ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ১৮০৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি তিনি এশিয়াটিক সোসাইটিকে দুখানি বড় ছবি উপহার দেন। ছবি দুটি ছিল মহাবলীপুরমের মন্দির ও ভাস্কর্যের। ১৮১০ সালের ৬ জুন তাঁর আঁকা একটি পেলিকানের ছবি সোসাইটিকে উপহার দেন। ১৮১৩ সালের ১৩ অক্টোবর এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার উইলিয়ম জোনস্-এর একটি প্রতিকৃতি তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানকে উপহার দেন। খুবই সামান্য মাল-মশলার উপর নির্ভর করে তাঁকে ঐ ছবি আঁকতে হয়েছিল।

হোম সতেরো বছর কলকাতায় বাস করেছিলেন আর এই সময় অজস্র ছবি তিনি এঁকেছিলেন। তাঁর একেবারে প্রথম দিককার ছবির মধ্যে ছিল স্যার রবার্ট চেম্বার্স-এর একটি প্রতিকৃতি। হাইকোর্টের জজেস লাইব্রেরিতে এটি রক্ষিত ছিল।

১৮০৪ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতার গবর্নর হাউসের কয়েকটি ছবির সংস্কারের জন্য হোম ২০৫০ সিক্কা টাকা দক্ষিণা পেয়েছিলেন।

১৮২৪ সালে লখনৌ-এ বিশপ হেবার-এর সঙ্গে দেখা হয়েছিল হোম-এর। বিশপ হেবার তাঁর জার্নালে লিখেছেন :

'একটি পোর্ট্রেটের জন্য হোম-এর কাছে আমি চারটি সিটিং দিয়েছি। তিনি অযোধ্যার রাজার কয়েকটি যৌবনদীপ্ত এবং হীরকখচিত প্রতিকৃতি

এঁকেছিলেন এবং এঁকেছিলেন স্যার প্যাজেটের একটি প্রতিকৃতিও, আর এক্ষেত্রে সাদৃশ্য রচনা না করে তিনি পারেননি। তিনি সত্যিই একজন ভালো চিত্রশিল্পী ছিলেন এবং অযোধ্যার রাজা একজন খুব উপযুক্ত লোককেই পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন খুবই ভদ্র, লণ্ডনের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসকের ভ্রাতা। তিনি মাদ্রাজ এসেছিলেন লর্ড কর্নওয়ালিসের আমলে চিত্রশিল্পীর পেশা অনুসরণ করার অভিপ্রায়ে। মৃত্যুর কিছু পূর্বে সাদাত আলি তাঁকে সেখান থেকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন লখনৌ-এ। সেই থেকে তিনি সেখানে বাধা মাইনের চাকরী করছেন এবং কিছু উপরি আয়ও করেছেন ব্যক্তিগতভাবে কাজ করে। তাঁর পুত্র ক্যাপ্টেন হিসেবে কোম্পানির কাজে নিযুক্ত ছিলেন, এখন অযোধ্যার রাজার ইওরোপীয় এডিকং। হোম যদি ইওরোপে থাকতেন তাহলে একজন বিশিষ্ট শিল্পী হতে পারতেন। তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল এবং ড্রয়িং ছিল খুব ভালো এবং দ্রুত। কিন্তু তার মতো একটা অসুবিধা ছিল, নিজের আঁকা ছবি ছাড়া আর কারো ছবি খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ তাঁর ছিল না। প্রভুকে সন্তুষ্ট করার জন্যই তিনি অতি উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার করতেন।'

হোম এ-দেশেই থেকে গিয়েছিলেন, আর পাঁচজন সতীর্থের মতো প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করে দেশে ফিরে যাননি।

এদেশে দীর্ঘকাল অবসরজীবন যাপন করায় লোকে সম্ভবত তাঁকে ভুলে গিয়েছিল আর সেই কারণেই সম্ভবত ফলাও করে তাঁর মৃত্যু সংবাদ ছাপা হয়নি। প্রায় ১১ দিন পরে 'ইংলিশম্যান' পত্রে তাঁর মৃত্যু সংবাদ দিয়ে লেখা হয় :

'কানপুরে বিগত ১২ তারিখে ৮৩ বৎসর বয়সে রবার্ট হোম (-এর মৃত্যু হয়)। আমাদের সমাজে খুব কম লোকই হোম-এর মতো এত দীর্ঘকাল ধরে পরিচিত এবং সর্বজন বন্দিত ছিলেন—তার পেশাগত দক্ষতার এবং অন্যবিধ বহু গুণের জন্য।'

এশিয়াটিক সোসাইটিকে তাঁর যেসব ছবি উপহার দেওয়া হয়েছিল

তাকে দুভাগে ভাগ করা যায়। একভাগে পড়ে হোম-এর আঁকা ১৩টি প্রতিকৃতি চিত্র আর দ্বিতীয় ভাগে পড়ে ২০টি বিবিধ ধরনের ছবি। এর মধ্যে বিশেষভাবে চোখে পড়ে—সমুদ্রে প্রতিকূল আবহাওয়া, ভগ্ন সেতু এবং গ্রামের ঘাট প্রভৃতি কয়েকটি ছবি।

যদিও চিত্রশিল্পী হিসেবেই সমধিক পরিচিত, হোম কিন্তু অন্যবিধ কাজও করেছেন, যথা—রাজকীয় শকট, নৌকা এবং হাওদার ডিজাইন রচনা করা এবং তার নির্মাণ-কার্য তদারক করা এবং রাষ্ট্রীয় মণিরত্ন সেটিং করা।

চার্লস ডয়েলি

ধর্মতলা-চৌরঙ্গীর মোড়ে সেক্রেড হার্ট গীর্জাটি এখনও আছে। এই গীর্জাটির ছ'পাশে ছিল খানকয় একতলা ও দোতলা বাড়ি। ফুটপাত ছিল না। রাস্তাটা আরও একটু চওড়া দেখাত। ট্রাম ছিল না, মোটর গাড়ি ছিল না। জুড়ি-গাড়ি, ফিটন, ল্যাণ্ডো চড়ে চলাফেরা করত সাহেব-বিবিরা, পয়সাওলা বাঙালি বাবুরা। দিব্যি ঘোড়ায় চেপে ছল্‌কি চালে চলত কেউ-বা। গোরু-মোষ নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়াত।

ক্লাইভ স্ট্রিট (বর্তমান নেতাজী সুভাষ রোড) এখন কলকাতার বাণিজ্যকেন্দ্র। সারা ছনিয়া জোড়া তার নাম-ডাক। এই ক্লাইভ স্ট্রিট ছিল একটা এঁদো গলি।

নীয়ন-প্রসাধিতা অতি-আধুনিকা এসপ্লানেড ছিল ভাবলেশহীন বালিকা। ময়দানে রেলিংবিহীন কয়েকটা নিঃসঙ্গ পুকুর আকাশের দিকে চেয়ে তারা গুণত।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এই ছিল কলকাতার চেহারা। স্যার চার্লস ডয়েলি এই কলকাতাকে ধরে রেখেছেন তাঁর 'ভিউজ অব ক্যালকাটা'র আঠারোখানা ছবিতে।

স্যার চার্লস শুধু যে কলকাতার ল্যাণ্ডস্কেপই এঁকেছিলেন তা নয় ; কর্মব্যাপদেশে বহু জায়গায় তাঁকে ঘুরতে হয়েছে, সেই সব জায়গার দৃশ্য এবং জীবনধারার একটি অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর স্কেচবুকের পাতায়।

সেকালের কলকাতার দৃশ্য অবশ্য আরও অনেকে এঁকেছেন। তাঁরা ডয়েলির চেয়ে অঙ্কনবিদ্যায় কিছু কম পারদর্শী ছিলেন তাও নয়। আর আঠারো-উনিশ শতকের বাঙালির তথা ভারতবাসীর জীবনযাত্রার যে বিবরণ বেলজিয়ান শিল্পী বল্ট সলভিন্স রেখার পটে ধরে রেখে গেছেন, ডয়েলির স্কেচগুলি অঙ্কনদক্ষতা বা ব্যাপ্তি কোনো দিক দিয়েই তার সঙ্গে তুলিত হতে পারে না। তবে এক বিষয়ে ডয়েলি অতুলনীয়। তাঁর ছবিতে সেকালের ভারতপ্রবাসী ইওরোপীয়দের জীবনযাত্রার যে অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় তা সম্ভবত আর কোনো সমসাময়িক শিল্পীর ছবিতে পাওয়া যাবে না।

ডয়েলি পেশাদার শিল্পী ছিলেন না। তিনি ছিলেন সিভিলিয়ান। কর্মব্যাপদেশে প্রায় চল্লিশ বছর এদেশে বাস করেছেন। এদেশ, এদেশের মানুষ ও চাকুরীয়া ইংরেজদের ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। এই অভিজ্ঞতাকেই তিনি তাঁর এই ছবিতে কাজে লাগিয়েছেন।

স্যার চার্লস ডয়েলির জন্ম ভারতবর্ষে, ১৭৮১ সালে। তাঁর বাবা শটিশহ্যামের ষষ্ঠ ব্যারনেট স্যার জন হ্যাডলি ডয়েলি। স্যার জন কলকাতার কালেক্টর ছিলেন। পরে ইপ্‌সউইচ থেকে পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

স্যার চার্লস ১৭৮৫ সালে পরিবার-পরিজনবর্গের সঙ্গে ইংলণ্ড যান, লেখা-পড়া শেখেন সেখানেই। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সিভিল সার্ভিসে যোগ দেবেন মনস্থ করে তিনি কলকাতা ফিরে আসেন এবং ১৭৯৮ সালে কলকাতার আপীল কোর্টের রেজিস্ট্রারের সহকারী নিযুক্ত হন। তারপর একে একে গভর্নর জেনারেলের আপিসের রেকর্ড-

কীপার, ঢাকার কালেকটর কলকাতার কালেকটর, বিহারের অহিফেন এজেন্টের পদ পান। শেষ পর্যন্ত ১৮৩৩ সালে শুল্ক, লবণ ও অহিফেন বোর্ডের ও নৌ-বোর্ডের সিনিয়র সদস্য নিযুক্ত হন। চল্লিশ বছর সম্মানের সঙ্গে চাকুরি করার পর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ায় ১৮৩৮ সালে তিনি ইংলণ্ড ফিরে যেতে বাধ্য হন। তাঁর শেষ জীবনটা অধিকাংশই কেটেছে ইতালীতে। ১৮৪৫ সালে লেগহর্নে তাঁর মৃত্যু হয়।

ছবি আঁকা ডয়েলির পেশা না হলেও তুলি চালনায় তাঁর কিছু দক্ষতা ছিল।

আঠারো শো বাইশ সালে কলকাতার তৃতীয় বিশপ নিযুক্ত হয়ে আসেন হিবার। ধর্মপ্রচারের জন্য তিনি উত্তর ভারতে এবং সিংহলে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছিলেন। 'জার্নি থ্রু দ আপার ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে বিশপ হিবার তার সেই ভ্রমণের একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

বিশপ হিবার উত্তর ভারত সফরকালে বাঁকীপুরে স্যার চার্লসের আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেই সময় স্যার চার্লস-এর ছবি আঁকার খাতা দেখার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। বিশপ তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'স্যার চার্লস-এর ছবি আঁকার খাতা দেখে খুবই আনন্দ পেলাম, কৌতূহলও জাগ্রত হল। যে ক-জন ভদ্রলোক-শিল্পীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে তার মধ্যে উনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। উনি বললেন, গঙ্গার তীর ছেড়ে যদি একটু ভেতর দিকে যাওয়া যায় তাহলে ভারতবর্ষ সত্যিই খুব সুন্দর দেশ। ওঁর নিজের আঁকা ছবি দেখেই বুঝলাম ওঁর কথাটা কত সত্যি।'

বিশপ হিবার যে বাড়িয়ে বলেননি, ডয়েলির অ্যালবামের পাতা ওল্টালেই তা বোঝা যাবে।

ছবি আঁকাটা ডয়েলির নেশা হলেও নেশাটা যে তাঁকে পেয়ে বসেছিল তাতে সন্দেহ নেই এবং এও ঠিক যে এরই তাড়নায় তাঁর

অবসরের বেশ একটা অংশ ব্যয়িত হয়েছে।

সে সময় তাঁর অনেকগুলি অ্যালবামই ভারতবর্ষ এবং বিলেত থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে 'দ ইওরোপীয়ান ইন ইণ্ডিয়া,' 'অ্যান্টিকুইটিস অব ঢাকা', 'স্কেচেজ অন দ নিউ রোড', 'ইণ্ডিয়ান স্পোর্টস', 'ভিউজ অব ক্যালকাটা', 'বিহার অ্যামেচার লিথোগ্রাফিক স্ক্র্যাপবুক', 'দ কস্টিউমস অ্যাণ্ড কাস্টমস অব মডার্ন ইণ্ডিয়া' বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

স্যার চার্লস শুধু যে ছবিই এঁকেছেন তা নয়, কবিতা লেখাতেও হাত মকসো করেছেন। ১৮২৮ সালে 'টম র—দ গ্রিফিন' অর্থাৎ নবাগত টম র নামে একটি ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতা তিনি ছদ্মনামে প্রকাশ করেছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এক ক্যাডেটের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সরস কাহিনী এই কবিতাটির বিষয়বস্তু। কবিতাটির সঙ্গে পঁচিশখানি এনগ্রেভিং করা ছবি ছিল। কবিতাটির সাহিত্যমূল্য যৎসামান্য হলেও সেকালের সমাজচিত্র হিসাবে এর মূল্য আছে। তাছাড়া সঙ্গের ছবিগুলিও ছিল মজাদার।

ডয়েলির ছবির বইগুলির মধ্যে 'বিহার অ্যামেচার লিথোগ্রাফিক স্ক্র্যাপবুকে' আছে বাঙলা বিহার ও উত্তর প্রদেশের গ্রাম ও শহরের জীবনযাত্রার স্কেচ। 'ইণ্ডিয়ান স্পোর্টস' শিকারের ছবির অ্যালবাম। নতুন সড়ক ধরে কলকাতা থেকে গয়া যেতে যেতে এঁকেছিলেন 'স্কেচেজ অন দ নিউ রোডের' ছবিগুলি। 'ভিউজ অব ক্যালকাটা' ও 'অ্যান্টি-কুইটিস অব ঢাকা'য় সেকালের কলকাতা ও ঢাকার দৃশ্য আছে।

'দ কস্টিউমস অ্যাণ্ড কাস্টমস অব মডার্ন ইণ্ডিয়া' নামটা কিছুটা বিভ্রান্তিকর। নাম দেখে মনে হতে পারে ভারতবর্ষের লোকেদের আচারব্যবহার, পোশাক-আশাকের ছবি আছে অ্যালবামটিতে। আসলে কিন্তু তা নয়। ভারতপ্রবাসী ইংরেজদের আচার-ব্যবহার, পোশাক-আশাকই বর্ণিত হয়েছে ছবিগুলিতে। ছবিতে ভারতীয় কয়েকজন আছে বটে কিন্তু তারা প্রধানত ভৃত্যশ্রেণীর লোক।

অ্যালবামটি লণ্ডন থেকে প্রকাশ করেছিলেন এডোয়ার্ড অরমে যিনি ১৮০৪ সালে 'দ কস্টিউমস অব হিন্দুস্তান' নাম দিয়ে বল্ট সলভিন্সের চিত্রাবলীর একটি কাটছাট করা সংস্করণ বেআইনিভাবে বের করেছিলেন। সলভিন্সের ছবির চাহিদা দেখেই প্রকাশক সম্ভবত ডয়েলির অ্যালবামের নামকরণে এই কারসাজিটি করেছিলেন। কেননা হুবহু এই ছবিগুলিই 'দ ইওরোপীয়ান ইন ইণ্ডিয়া' নামে ১৮১৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। 'দ ইওরোপীয়ান ইন ইণ্ডিয়াতে' অবশ্য ব্লাগডন-কৃত প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সংযোজিত হয়েছিল। দুই বইয়েরই ভূমিকা এবং ছবির বিস্তৃত পরিচয় লিখেছেন ক্যাপটেন টমাস উইলিয়মসন ও এনগ্রেভিং করেছেন জে এইচ ক্লার্ক এবং সি ডুবর্গ।

সেকালের ইংরেজ চাকুরীয়ারা সদঅসৎ নানা উপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে বিলাস-ব্যসনে রাজার হালে দিন কাটাত। প্রত্যেকের গণ্ডা কয়েক ভৃত্য থাকত। এদেশীয়দের অনুকরণে তারা তামাক খেত, বাঈ নাচ দেখত। দিবানিদ্রার অভ্যাস তাদের মধ্যে এত ব্যাপক ছিল যে কটন সাহেব তাঁর বইতে লিখেছেন, দুপুরবেলা কলকাতার রাস্তায় একজন ইওরোপীয়ানেরও টিকি দেখা যেত না। তাঁদের এই বাদশাহী জীবনযাত্রা এমন কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল যে ভারত-ফেরত ইংরেজরা সেকালে বিলেতে 'নবাব' বলে আখ্যাত হত।

'দি ইওরোপীয়ান ইন ইণ্ডিয়া' বা 'কস্টিউমস অ্যাণ্ড কাস্টমস অব মডার্ন ইণ্ডিয়া'র ছবিগুলিতে এই ইংরেজ চাকুরীয়াদের বিলাসবহুল জীবনের একটি প্রামাণ্য অথচ বর্ণাঢ্য চিত্র পাওয়া যায়। মোট ২৬ খানা ছবি আছে অ্যালবামটিতে। প্রত্যেকটি ছবির সঙ্গে উইলিয়ামসন যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে অনেক তথ্য আছে। এখানে তা পরিবেশন করা সম্ভব নয়। তবে সেকালের কেরানীদের সম্পর্কে সাহেবের রসাল বর্ণনা কিছুটা উদ্ধার করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। উইলিয়মসন লিখেছেন :

'সমস্ত সরকারী আপিসে এবং কিছু সওদাগরী আপিসে কেরানী নিয়োগ করা হয়। এরা অধিকাংশই হিন্দু। হাতের লেখা পরিষ্কার এবং মোটের উপর তাড়াতাড়ি লিখতে পারে এই যোগ্যতাবলেই তারা কাজ পায়। হয়ত আশ্চর্য শোনাবে, তাহলেও কথাটা সত্য—যারা গড়গড় করে ইংরেজী বলে এবং লেখে তারা দশটা কথার মধ্যে অন্তত একটা কথার মানে জানে না। অনেকে নিতান্তই মাছিমারা কেরানী। মুক্তার মত হরফে যে চিঠি তারা কপি করে তার এক বর্ণও তারা বোঝে না। এদের মধ্যে অনেকে আবার খুবই পণ্ডিতম্মন্য। সুযোগ পেলেই তারা তাদের বিদ্যাবত্তা জাহির করতে ছাড়ে না। অনেকে ডিকশনারী কণ্ঠস্থ করে ফেলে। নীচে একটি চিঠির নকল দেওয়া হলো। এটি পড়লেই বোঝা যাবে, পণ্ডিতম্মন্য ভদ্রলোকটি ডক্টর জনসনের ডিকশনারী একেবারে গুলে খেয়েছেন :

Honourable Sir

Last night monstrous breeze come, make all house palpitate. Window shutters very much agitated and after much trepidation, relinquish from the frame, and subside to the ground. I make carpenter come to conjoin immediately. Mistrees very great fright.'

একেই বলে মশা মারতে কামান দাগা! কেরানীপ্রবর যা লিখেছেন তার সারমর্ম এই যে, ঝড় হওয়ায় জানালার পাট ভেঙে গেছে। মেমসাহেব তাতে ভয় পেয়েছেন। করিতকর্মা কেরানীপ্রবর ছুতোর ডেকে জানালার পাট সারাবার ব্যবস্থা করেছেন।

সচেতনভাবে, সমাজতাত্ত্বিকের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ডয়েলি 'দ ইওরোপীয়ান ইন ইণ্ডিয়া'র ছবিগুলি এঁকেছিলেন—একথা হয়ত সত্য নয়। ভূমিকায় ক্যাপটেন উইলিয়ামসন অন্য কথাই বলেছেন : 'অসংখ্য এবং অতি সম্ভ্রান্ত পাঠকেরা যাঁদের জ্ঞানের তৃষ্ণা অপরিসীম,

বা যাঁদের বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনেরা ভারতে গিয়েছিলেন বা বর্তমানে ভারতে আছেন, আশা করি বইটি তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণের অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। তাঁদের কাছে অন্তত বইটি উপাদেয় মনে হবে। কিন্তু যাঁরা প্রাচ্যদেশে যাত্রা করবেন তাঁদের অনেকের কাছেই বইটির মূল্য আরও বেশী হবে।

'কাজে লাগাবার এবং যুগপৎ আনন্দ দেবার ইচ্ছার বশবর্তী হয়েই আমি যত বেশী সম্ভব তথ্যের সমাবেশ করেছি এই ভূমিকাতে…'

উইলিয়ামসন মিথ্যে বলেননি। ভারতবর্ষে গেলে কি ধরনের পোশাক-আশাকের প্রয়োজন হবে, কি ভাবে চললে স্বাস্থ্যরক্ষা হবে, কোন লোকেদের সম্পর্কে সাবধান থাকতে হবে—এ সমুদয় তথ্যই ভূমিকাটিতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এ-সব তথ্যের আজ আর অবশ্য কোনো মূল্য নেই কিন্তু এই সঙ্গে সেকালের ইওরোপীয়দের জীবনযাত্রার যে বিবরণ উইলিয়ামসন দিয়ে গেছেন, সেকালের সামাজিক ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিল হিসাবে তার যথেষ্ট মূল্য আছে।

ডয়েলির সব ছবি এখানে ছাপা সম্ভব নয়, তাই উইলিয়ামসনের ভূমিকাটি একটু বিস্তৃতভাবেই উদ্ধৃত করছি।

'যাঁরা অশ্বারোহণ ব্যায়ামে অভ্যস্ত, ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে তাঁরা বেরিয়ে পড়েন, ফেরেন সূর্যোদয়ের বেশ কিছুক্ষণ পরে। শীতকাল বা আবহাওয়া অনুকূল থাকলে প্রাতরাশের পরেও বেরোন যেতে পারে।

'চা-কফি-ডিম-টোস্ট-মাছ (ভাজা অথবা লবণ মাখান, ভাত ইত্যাদি) এই হচ্ছে প্রাচ্যদেশের খাদ্যতালিকা। অনেক ভদ্রলোক, বিশেষ করে যারা উত্তর ইংলণ্ডের অধিবাসী, এর সঙ্গে যোগ করেন মিঠাই ও সুজি। সুজি পরিজের বিকল্প। পরিজ তৈরী হয় জই থেকে আর সুজি গম থেকে। ভারতবর্ষে জইয়ের চাষ হয় না, যদিও জংলা কালো জই যত্রতত্র অসংখ্য জন্মে থাকে।

'প্রথম বেলাটা কেউ কাজ করে, কেউবা একটু লেখা-পড়া করে।

যারা একটু অলস প্রকৃতির তারা হুঁকো টেনে এবং শেষ অব্দি তাস পিটিয়ে সময় কাটায়। যাদের আপিস-কাছারী আছে তারা পাল্কী করে কর্মস্থলে যায়। কাজ করতে হয় চার-পাঁচ ঘণ্টা। তারপর কেউ বাড়ি ফেরে, কেউবা যায় বন্ধু সন্দর্শনে। বাড়ি ফিরে কিছু জলযোগ করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত একটানা ঘুম। তারপর পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে ডিনারে বসা।

'কফি বা চা সাধারণত আটটা-নটার মধ্যে দেওয়া হয়। কলকাতা এবং মফস্বলে সিভিলিয়ানের বাড়ি ছাড়া সান্ধ্য ভোজের রেওয়াজ নেই। সামরিক কর্মচারীরা অবশ্য সকাল সকাল কাজ সারেন। গোরাবাজারে রাত দশটার পর কাউকে বিছানার বাইরে আর ভোর পাঁচটার পর কাউকে বিছানায় দেখা যাবে না। এর প্রধান কারণ নারীসঙ্গের অভাব। ভারতবর্ষে অল্প কয়েকজন মাত্র ইওরোপীয়ান মহিলা আছেন। যদি বলি বাঙলা সরকারের এলাকায় তিনশ জন ইওরোপীয় মহিলা বাস করেন তাহলেও হয়ত বেশী বলা হবে।

'সত্যিকথা হচ্ছে এই, বিবাহ ব্যাপারটা বড়ই ব্যয়সাধ্য। পেশার দায়িত্ব পালনেও তা যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটায়।…তাছাড়া কর্মজীবনের শুরুতেই অনেক যুবক এ-দেশের রমণীদের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে এবং তাদের সমাজ ও আচার-ব্যবহারে অনুরক্ত হয়ে পড়ে। অচিরেই এই আকর্ষণ অন্যসব আকর্ষণকে ছাপিয়ে ওঠে। আর যেহেতু এই সব কৃষ্ণকায়া (অনেকের রঙ আবার বেশ পরিষ্কার) সঙ্গিনীরা শিবিরের অনুগমন করে এবং তাদের রক্ষকদের থেকে তারা প্রায় অবিচ্ছেদ্য, রক্ষকদের তারা গণ্ডা গণ্ডা সন্তান উপহার দেয়—তাই প্রায় খেলাচ্ছলে যে সম্পর্কের সূচনা তা অনেক সময় স্থায়ী হয়ে পড়ে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এ-নিয়ে অনেক কথাই বলা যেতে পারে কিন্তু প্রসঙ্গটা এতই কুণ্ঠাজনক যে এ-নিয়ে আমার পক্ষে বাগবিস্তার করা শোভা পায় না। তবে একটা কথা এখানে বলে রাখা প্রয়োজন। অনেকের ধারণা আছে যে আমাদের স্বদেশিনী সুন্দরীদের উপেক্ষা করে

তারা (প্রবাসী ইংরেজরা) বুঝি কৃষ্ণাঙ্গিনীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ ধারণা ঠিক নয়। এ-ধরনের যোগাযোগ প্রধানত প্রয়োজনের তাগিদেই হয়ে থাকে।

'এদেশের ভদ্রলোকেরা বহুসংখ্যক ভৃত্য নিযুক্ত করে থাকেন, এ-নিয়ে অনেক অসদ্ভদ্র নিন্দাবাদ প্রচলিত আছে। নেটিবদের মধ্যে নানারকম কুসংস্কার আছে আর তা প্রায় সংশোধনের অতীত। তাদের কতকগুলি রীতিনীতি আছে এবং কতকগুলি সুবিধা তারা বংশানুক্রমে ভোগ করে আসছেই। দীর্ঘকাল ইওরোপীয়দের সহবাসে এ-সবই হয়তো একদিন কেটে যাবে—কিন্তু জোর করে কিছু করতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। এই কারণেই অনেক প্রয়োজনীয় সংস্কার করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া, তাদের আশ্রয় দিলে প্রতিদানে তারা আমাদের গভর্নমেন্টকে সমর্থন করবে··· ।'

ইওরোপীয়দের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার সপক্ষে উইলিয়ামসন যে যুক্তি দিয়েছেন স্পষ্টতই তা অতি দুর্বল। কিন্তু আমরা সে বিচার করতে বসিনি। উইলিয়ামসনের এই বর্ণনায় সেকালের ইওরোপীয়দের জীবনযাত্রার যে আভাস আমরা পাই—আমাদের কৌতূহল সে সম্পর্কেই। ডয়েলির ছবিগুলি এই বর্ণনারই মূর্ত রূপ।

জর্জ চিনারি

ভারতবর্ষে বিদেশী শিল্পীদের সমাগম শুরু হয় আঠেরো শতকের মাঝামাঝি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তখন ভারতবর্ষের বৃহত্তর অংশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসেছে। ইংরেজদের মধ্যে প্রথম এসেছিলেন (১৭৬৯) টিলি কেটল। তার সাফল্যের সংবাদ ওদেশে পৌঁছলে অনেক শিল্পীই ভাগ্যান্বেষণে ভারত অভিমুখে রওনা হন। ১৭৮০ সাল থেকে আঠেরো শতকের শেষ—এই সময়টাকে বলা যেতে পারে বিদেশী শিল্পীদের অভিযানের তেজী-র যুগ। মন্দা শুরু হয় তারপর থেকেই। পরিসংখ্যানের সাক্ষ্য সেই কথাই বলে। ১৭৮০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে ৩৭ জন পেশাদার ইংরেজ শিল্পী ভারতবর্ষে এসেছিলেন আর ১৮০০ থেকে ১৮২০ সালের মধ্যে এসেছেন মাত্র ১৬ জন ইংরেজ শিল্পী। উনিশ শতকের প্রথম অর্ধে ইংরেজ শিল্পীদের ভারত আগমন প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

ভারত-ব্রিটেনের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের এই অধ্যায়টি দুটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, এই সব শিল্পীরা ভারতীয় শিল্প-ধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। তার ফল ভালো

হয়েছিল কি মন্দ হয়েছিল—সে অবশ্য অন্য কথা। দ্বিতীয়ত, এই শিল্পীরা অধিকাংশই ছিলেন বস্তুবাদী। তাঁরা যে-সব ছবি এঁকেছিলেন তার মধ্যে সেকালের জীবনযাত্রা, মানুষজন, পোশাক-আশাক, আচার-আচরণের একটা বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ বিধৃত হয়ে আছে। আঠেরো-উনিশ শতকের বাঙলা তথা ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসের তা অতি মূল্যবান উপকরণ।

প্রধানত এই দ্বিতীয় কারণেই আমরা বিদেশী শিল্পীদের ভারত-অভিযানের ধারাটি অনুসরণ করে আসছি।

ইংরেজ শিল্পীদের ভারত-অভিযানের এই পর্বের শেষের দিকে এসেছিলেন জর্জ চিনারি। প্রথমে মাদ্রাজে এবং পরে কলকাতায় ফিরিঙ্গি সমাজের তিনি হয়ে উঠেছিলেন মধ্যমণি। শিল্পী হিসাবে তিনি এই সময় যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তার তুলনা হয় না।

জর্জ চিনারির জন্ম ১৭৬৬ সালে। বিলেতের 'রয়েল আকাদেমি'তে তিনি প্রথম ছবি পাঠিয়েছিলেন ১৭৯১ সালে। ১৭৯৮ সালে ডাবলিনের কলেজ গ্রীনে ভর্তি হন তিনি। এই সময় তিনি ল্যান্সডাউন পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। ১৮০১ সালে ডাবলিনের পার্লামেন্ট ভবনে একটি চিত্র প্রদর্শনী হয়েছিল। তাতে চিনারির এগারোখানা ছবি প্রদর্শিত হয়।

শিল্প প্রয়াসের এই প্রাথমিক পর্যায়ের পর পেশাদার শিল্পী হিসাবে লণ্ডনে এসে বসবাস শুরু করেন চিনারি।

কিন্তু তার আগেই তিনি একবার প্রাচ্য দেশ থেকে ঘুরে এসেছেন। যত দূর জানা গেছে ১৭৯৩ সালে তিনি পিকিং গিয়েছিলেন লর্ড ম্যাকার্টনির সঙ্গে।

চিনারি ভারতবর্ষে এসেছিলেন চীন দেশ ঘুরে। যত দূর জানা যায় ১৮০২ সাল নাগাদ তিনি মাদ্রাজে এসে পৌঁছান। চিনারি মাদ্রাজে ছিলেন সাকুল্যে পাঁচ বছর। মিনিয়েচার ছবি আঁকিয়ে হিসাবে তিনি এখানে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। তেল রঙের

ছবি আঁকাতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। চিনারি কলকাতা আসেন ১৮০৭ সালে। কলকাতায় তিনি প্রায় পনেরো বছর ছিলেন।

একটু খ্যাপাটে ধরনের লোক ছিলেন চিনারি, তবু কলকাতা সমাজে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তিনি, সেই সঙ্গে খ্যাতিও। একটার পর একটা কাজও তিনি পেতে লাগলেন। তাঁর বাৎসরিক আয় এক সময় পাঁচ হাজার পাউণ্ডে পোঁচেছিল।

তাঁর এই অসামান্য জনপ্রিয়তার একটা কারণ ছিল এই যে, তখন তেল রঙের ছবির কদর কমেছে। নবাব-বাদশাদের তখন ছুর্দিন পড়েছে। তেলরঙের বৃহদাকার ছবির দাম দেবার সাধ্য তখন কম লোকেরই ছিল। তদুপরি এদেশের জলবায়ুতে এই ছবিগুলি সহজেই খারাপ হয়ে যেত। কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যেও এ-ছবির চাহিদা কমেছিল। কেননা দেশে ফিরে যাবার সময় ছবিগুলি সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া ছুঃসাধ্য ছিল। তাছাড়া বাইরে থেকে বিলেতে ছবি আনতে গেলে মোটা হারে শুল্ক দিতে হতো। তাতে ঢাকের দায়ে মনসা বিকোবার জোগাড় হতো। কাজেই মিনিয়েচার ছবিরই তখন চাহিদা বেড়েছিল। আর হাতির দাঁতের উপর মিনিয়েচার ছবি আঁকায় তখন চিনারির জুড়ি কেউ ছিল না।

কিন্তু খেয়ালী মানুষ চিনারি সব ছবি শেষ করতে পারতেন না। অনেক ছবিই অসমাপ্ত, অর্ধসমাপ্ত থাকত। এদিকে চিনারি ছিলেন খরচে মানুষ। আয় যথেষ্ট ছিল, কিন্তু ব্যয় ছিল ততোধিক। ফলত তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর নিজের হিসেব অনুসারেই ১৮২২ সাল নাগাদ তাঁর দেনার অঙ্ক দাঁড়ায় চল্লিশ হাজার পাউণ্ড।

পাওনাদারদের তাগাদায় অতিষ্ঠ হয়ে চিনারি শেষ পর্যন্ত কলকাতা থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেন ড্যানিশ উপনিবেশ শ্রীরামপুরে। সেখান থেকে পাড়ি দেন চীনের দক্ষিণ উপকূলস্থ মাকাও দ্বীপের পর্তুগীজ উপনিবেশে।

চিনারির স্ত্রী বছর চারেক আগে ইংলণ্ড থেকে এসেছিলেন স্বামীর

গ্যাছে। জনশ্রুতি, স্ত্রীর হাতে থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যেই নাকি তিনি অত দূরে ম্যাকাও দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। শোনা যায় স্ত্রী ম্যাকাও দ্বীপ অভিমুখে রওনা হচ্ছেন শুনে তিনি তাড়াতাড়ি ক্যান্টনে গিয়ে আশ্রয় নেন। তখন ক্যান্টনের চীনা কর্তৃপক্ষ নিয়ম করেছিল, এই শহরে কোন শ্বেতাঙ্গ রমণী প্রবেশ করতে পারবেন না। এখানে কিছু-কাল কাটাবার পর যখন বুঝতে পারেন ফাঁড়া কেটে গেছে তখন আবার ম্যাকাও ফিরে যান চিনারি। এখানে ১৮৫২ সালে চিনারি মারা যান।

ম্যাকাও এবং ক্যান্টনে থাকবার সময়ও চিনারির শিল্পসাধনায় ছেদ পড়েনি। ডক্টর মরিসন চীনা ভাষায় বাইবেলের তরজমা করেন। চিনারি বাইবেলের তরজমারত মরিসনের একটি প্রতিকৃতি এঁকে পাঠান বিলেতের রয়েল আকাদেমিতে। ১৮৩০ সালে হঙ্ ব্যবসায়ীর একটি প্রতিকৃতিও তিনি বিলেতে পাঠিয়েছিলেন। ১৮৪৬ সালে তাঁর নিজের একটি প্রতিকৃতি রয়েল আকাদেমিতে স্থান পায়।

অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও চিনারি খুব উঁচুদরের শিল্পী ছিলেন না। তাঁর আঁকার হাত অবশ্য ভালো ছিল। সাদৃশ্য রচনায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাঁর আঁকা দৃশ্যচিত্রগুলিও সেকালে খুবই সমাদর পেয়েছিল। তবু শিল্প-সমালোচকের চোখ দিয়ে দেখতে গেলে তাতে মস্ত একটা ত্রুটি ধরা পড়বে—তা হচ্ছে কল্পনাশক্তির অভাব। তাঁর ছবি তাঁদের কাছে গদ্যময়, বিশেষত্ব বর্জিত বলে মনে হবে।

কিন্তু শিল্প-নিদর্শন হিসাবে চিনারির ছবির মূল্য যা-ই হোক—সেকালের মানুষজনের জীবনযাত্রার প্রামাণ্য দলিল হিসাবে তার বিশেষ মূল্য আছে।

ব্রিটিশ মিউজিয়মের প্রিন্ট রুমে চিনারির আঁকা ভারতীয়দের যে কয়েকটি রেখাচিত্র আছে তার দিকে তাকালেই এই উক্তির যথার্থতা বোঝা যাবে।

কলকাতার ডবলু থ্যাকার কোম্পানি 'এ সিরিজ অব মিসলেনিয়াস্ র‍্যাক স্কেচেজ অব ওরিয়েন্টাল হেডস' নামে চিনারির যে ছবির বইটি

প্রকাশ করেছিলেন তাতে ভারতীয়দের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের একটি বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ পাওয়া যায়। বইটি এখন দুষ্প্রাপ্য। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে অবশ্য বইটির একটি কপি রক্ষিত আছে।

'ভিউজ ইন মাদ্রাজ'-এ চিনারির মাদ্রাজ বসবাসের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত কয়েকটি রেখাচিত্র স্থান পেয়েছে। বিশেষ করে সমুদ্রে যারা মাছ ধরে বেড়ায় তাদের জীবনযাত্রার একটি অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় 'ভিউজ ইন্ মাদ্রাজে'র একাধিক রেখাচিত্রে। সেকালের মাদ্রাজ শহরের ঘর-বাড়ি যানবাহনের ছবিও আছে এই বইটিতে।

প্রত্যেকটি ছবির সঙ্গে ইংরেজি ভাষায় সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সংযোজিত হওয়ায় অ্যালবামটির মূল্য বেড়েছে।

যে সময়ের কথা বলছি তখন পেশাদার শিল্পী ছাড়া আরও অনেক বিদেশী এদেশে এসেছিলেন যাঁদের পেশা অন্য হলেও নেশা ছিল ছবি আঁকা। তাঁদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যাঁদের একাধিক ছবির বই থেকে সেকালের ভারতীয়দের জীবনযাত্রার তথ্যনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। ডয়েলি, অ্যাটকিনসন এই পর্যায়ের শিল্পী। ডয়েলি ছিলেন সিবিলিয়ান আর অ্যাটকিনসন সৈন্য বাহিনীর লোক। এমনি অপেশাদার শিল্পী হয়ত অনেকেই এসেছেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ছাড়া অন্যাদের গতিবিধি অনুসরণ করবার মতো যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের পরও হয়ত তাঁদের কেউ কেউ এদেশে ছিলেন। কিন্তু পেশাদার শিল্পীদের অভিযান এই সময়ই মন্দীভূত হয়ে আসে। চিনারি প্রায় বিশ বৎসরকাল ভারতবর্ষে ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে নতুন আর কোনো বিদেশী পেশাদার শিল্পী ভারতবর্ষে এসেছেন বলে জানা যায় না। চিনারি যখন এদেশ ছেড়ে চলে যান তখন মাত্র একজন ইংরেজ শিল্পীই এদেশে ছিলেন। তাঁর নাম রবার্ট হোম। তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন চিনারির কিছু আগে। কিন্তু চিনারি চলে যাবার পরও তিনি এদেশে থেকে যান এবং এদেশেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। যতদূর জানা যায় তিনিই আঠেরো-উনিশ শতকের বিদেশী শিল্পীদের ভারত অভিযানের শেষ পেশাদার শিল্পী।

কোলেসওয়ার্দি গ্রান্ট

তখন কলকাতায় পাকা বাড়ির সংখ্যা ছিল ১১,২১৫। তার মধ্যে ৭,৩৭৬টি বাড়ি ছিল একতলা। বাড়িগুলির আকার, আয়তন ও গঠনরীতিতে বৈচিত্র্য ছিল। কিন্তু প্রাসাদপুরী কলকাতায় প্রায় সব বাড়ির রঙই ছিল শাদা— অবশ্য শাদাকে যদি রঙ বলা যায়।

কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তখন খ'ড়ো বাড়ির সংখ্যাই ছিল অধিক। তাতে প্রায়ই আগুন লাগত। শেষ পর্যন্ত পুলিস কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে শহরের কয়েকটি স্থানে উঁচু মাচা বানানো হয়েছিল। তার উপর থেকে নজর রাখা হতো, কোথাও আগুন লেগেছে কি না। লাগলে শহরবাসীকে সতর্ক করে দেওয়া হতো।

তখন কলকাতায় জলের কল ছিল না। অনেক বাড়িতে পাতকুয়ো ছিল। কিন্তু তার জল পানের যোগ্য ছিল না। দেশীয়দের মধ্যে কেউ কেউ পবিত্র গঙ্গোদক পান করে যুগপৎ পুণ্য অর্জন ও পিপাসা নিবারণ করত। শহরে তখন ৫৩৭টি পুষ্করিণী ছিল। অন্যেরা তা থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করত। পুকুরগুলি অবশ্য সবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল না। শহরের

চার-পাঁচটি ভালো পুকুরের মধ্যে সেরা ছিল লালদীঘি। আর পাঁচটি পুকুরের মতো বৃষ্টির জল বা মাটির চোঁয়ান জল দিয়ে এটি ভর্তি করা হতো না, ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ পথে নদী থেকে জল এনে ভর্তি করা হতো লালদীঘি। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত এখানে জল নেবার জন্য ভিড় লেগে থাকত।

ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এই ছিল শহর কলকাতার চেহারা। ইংরেজ শিল্পী কোলেসওয়ার্দি গ্রান্ট কলমে, তুলিতে এই কলকাতার একটি অন্তরঙ্গ চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর 'অ্যান অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ডোমেস্টিক স্কেচ'-এ। ইংলণ্ডে তাঁর মায়ের কাছে চিঠির আকারে লেখা এই বইটি প্রকাশিত হয়েছিল 'অ্যান আর্টিস্ট ইন ইণ্ডিয়া'—এই ছদ্মনামে। পরে ঐ একই ছদ্মনামে তিনি আরও একটি বই প্রকাশ করেছিলেন। তার নাম 'রুরাল লাইফ ইন বেঙ্গল'। এই বইটিও পত্রাকারে লেখা—তবে মায়ের কাছে নয়, বোনের কাছে।

প্রথম বইটি, অর্থাৎ 'অ্যাংলোইণ্ডিয়ান ডোমেস্টিক স্কেচ' ছাপা হয়েছিল কলকাতার সার্কুলার রোডস্থ ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে। বইটির প্রকাশকাল ১৮৪৯। প্রকাশক—ডবলু থ্যাকার অ্যাণ্ড কোম্পানি। বইয়ের মধ্যে লেখক যে ভূমিকা সংযোজিত করেছেন তাতে তারিখ আছে ডিসেম্বর, ১৮৪৮। সম্ভবত ঐ সময়ে বইটি তিনি প্রেসে দিয়েছিলেন। উৎসর্গপত্র থেকে জানা যায়, শিল্পী তাঁর মায়ের কাছে যে চিঠিগুলি লিখেছিলেন, বইটি তারই জের। চিঠিগুলি ইংলণ্ডে খুবই নাকি সমাদৃত হয়েছিল। হাতে লেখা চিঠিগুলি নাকি সেখানে হাতে হাতে ঘুরত। তাই শুনে শিল্পী চিঠিগুলি সংশোধন ও পরিবর্জন করে প্রকাশের আয়োজন করেন। কিন্তু বইটির ছাপার কাজ শেষ হবার আগেই তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়। মায়ের হাতে না দিতে পেরে মায়ের স্মৃতির উদ্দেশে ব্যথিতচিত্তে শিল্পী বইটি উৎসর্গ করেন।

এই উৎসর্গপত্র থেকে অনুমান করা যায় ১৮৩৮–৩৯ সালে তিনি কলকাতায় ছিলেন।

'রুর‍্যাল লাইফ ইন বেঙ্গল' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৯ সালে। লেখকের ভূমিকা থেকে জানা যায় বইটি লেখা হয়েছিল পাঁচ বছর আগে অর্থাৎ ১৮৫৪ সালে। এই বইটিতে সেকালের গ্রামজীবনের একটি অন্তরঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়।

কলকাতায় অবস্থানকালে গ্রান্ট অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন. শরীর সারাবার জন্য তিনি নদীয়া জেলার সুখসাগরে ইংরেজদের এক কুঠিতে অতিথি হয়েছিলেন। এই গ্রামে বাস করতে গিয়ে বাংলার গ্রামজীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় নিবিড় হয়েছিল। শিল্পী হলেও গ্রান্ট তন্নিষ্ঠ গবেষকের দৃষ্টি ও মানসিকতার অধিকারী ছিলেন- এই বইটিতে এবং 'অ্যাংলোইণ্ডিয়ান ডোমেস্টিক স্কেচ'-এ তার পরিচয় পাওয়া যায়।

'রুর‍্যাল লাইফ ইন বেঙ্গল' শুধু একটি সচিত্র ভ্রমণকাহিনী নয়, এই বইটিতে তিনি তৎকালীন বাঙলার ভূমিব্যবস্থা, কৃষিপদ্ধতি, কৃষকের অবস্থা এবং কৃষিজাত দ্রব্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। বইটিতে নীলচাষ এবং নীল প্রস্তুত প্রণালীর একটি সচিত্র প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া যায়। তখন নীলকরেরা কীভাবে বাঙলার চাষীকে শোষণ করত, গ্রান্ট তারও বিবরণ দিয়েছেন ভগ্নীর কাছে লেখা এই চিঠিগুলিতে।

গ্রান্টের স্বনামে প্রকাশিত ছবির বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— লিথোগ্রাফিক স্কেচেজ অব দি পাবলিক ক্যারেকটারস অব ক্যালকাটা, স্কেচেজ অব ওরিয়েন্টাল হেডস ও রাফ পেন্সিলিংস অব এ রাফ ট্রিপ টু রেঙ্গুন।

১৮৩৮ থেকে ১৮৪৫ সালের মধ্যে ইণ্ডিয়া রিভিয়ু, ইণ্ডিয়া মেডিকেল, ক্যালকাটা মান্থলী, বেঙ্গল স্পোর্টিং জার্নাল, ক্যালকাটা ক্রিশ্চান অবজারভার ও ইণ্ডিয়ান স্পোর্টিং রিভিয়ু পত্রিকায় গ্রান্টের আঁকা সেকালের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের যেসব ছবি প্রকাশিত হয়েছিল তার থেকে বাছাই করা ১২৪ খানি ছবি 'লিথোগ্রাফিক স্কেচেজ অব দি পাবলিক ক্যারেকটারস'-এ সংযোজিত হয়েছে। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন

বন্দ্যোপাধ্যায়, আলেকজাণ্ডার ডাফ, মার্শম্যান, প্রিন্সেপ, ডি এল রিচার্ডসন, জাল প্রতাপচাঁদ, ট্রেভেলিয়ান প্রভৃতির প্রতিকৃতি এই ছবির বইটিতে আছে।

'স্কেচেজ অব ওরিয়েন্টাল হেডস'-এ আছে ১৮৩৮ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে আঁকা ৩৫ খানি স্কেচ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এই ছবিগুলির মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এর মধ্যে অবশ্য ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন উপজাতির মানুষের ১১ খানি ছবিও আছে। তখন ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিল।

১৮৪৬ সালে গ্রাণ্ট এক মাসের জন্য রেঙ্গুন বেড়াতে গিয়েছিলেন। 'রাফ পেন্সিলিংস অব এ রাফ ট্রিপ টু রেঙ্গুন' সেই অভিজ্ঞতার সচিত্র বিবরণ। এই বইটি তাঁর ভ্রাতার কাছে পত্রের আকারে লেখা। সাকুল্যে প্রায় ৪৫ খানি স্কেচ আছে বইটিতে। তার মধ্যে কয়েকটি অবশ্য 'ওরিয়েন্টাল হেডস' থেকে গৃহীত।

গ্রাণ্টের আঁকার হাত বেশ ভালো ছিল—তাঁর ছবিগুলি এই সাক্ষ্যই দেবে। কিন্তু সে কথা বাদ দিলেও রেখায় এবং লেখায় সেকালের বাঙলা দেশের জীবনযাত্রার যে অন্তরঙ্গ পরিচয় তিনি তাঁর বইগুলিতে ধরে রেখে গেছেন ইতিহাসের দলিল হিসাবে তার মূল্য অপরিসীম।

গ্রাণ্ট যে সময় বাঙলা দেশে এসেছিলেন তখন পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার অভিঘাতে নবজাগৃতির সূচনা হয়েছে। সমাজদেহে লেগেছে বেগের প্রচণ্ড আবেগ। এই নবজাগৃতির প্রাণকেন্দ্র কলকাতা তখন দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে।

গ্রাণ্ট অবশ্য বিদেশীর চোখেই কলকাতাকে দেখেছেন এবং প্রধানত বিদেশীদের জীবনযাত্রার বিবরণই লিপিবদ্ধ করেছেন। তবু, যুগসন্ধির এই কলকাতার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'অ্যাংলোইণ্ডিয়ান ডোমেস্টিক স্কেচ'-এ। এখানে তাই গ্রাণ্ট-বর্ণিত কলকাতা-কাহিনী কিছুটা বিস্তৃতভাবেই অনুসরণ করা হবে।

প্রথমে ঘর বাড়ির বর্ণনা থেকেই শুরু করা যাক। গ্রাণ্ট লিখেছেন,

বাইরে থেকে দেখতে প্রাসাদপুরী কলকাতার বাড়িগুলিতে বৈচিত্র্য থাকলেও ভেতরের চেহারা প্রায় সব বাড়িরই এক রকমের। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই আছে বড় একটা হল ঘর। চুনকাম করা নিরলঙ্কার দেওয়াল। প্রকাণ্ড জানালা। জানালায় দু'জোড়া পাল্লা। এক জোড়া কাচের, অন্য জোড়া কাঠের ঝিলমিল দেওয়া। শোবার ঘরে কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নেই। তবে, বিছানায় গরমের দিনে কেউ কেউ মাদুর পেতে নিত। কেউবা জলে ভিজিয়ে নিত সেই মাদুর। কেউবা রাত্রে গরমের জ্বালায় ছাতের মেঝেয় গড়াগড়ি দিত।

গ্রান্ট যে সময়ের কথা লিখেছেন তখন বিজলী বাতি বা পাখা ছিল না, এয়ারকণ্ডিশনিং-এর কথ কেউ কল্পনাও করতে পারত না। অনুমান করতে কষ্ট হয় না, কলকাতার গরমে শীতের দেশের মানুষদের খুবই কষ্ট হতো। গরমের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য দিনের বেলা দরজা জানালা বন্ধ করে তারা ঘর অন্ধকার করে রাখত। কেউ কেউ খসখসের টাটি ঝোলাত। টানা-পাখ খাটাত।

মশা-মাছি পোকা মাকড়ের উপদ্রব তখন প্রবল ছিল। মশারী না খাটিয়ে শোওয়া যেত না। কেউ কেউ তাই মশারীর মধ্যেই ছোটো টানা-পাখা খাটিয়ে নিত। কোন এক আমেরিকান ব্যবসাদার তখন জাহাজ ভাড়া করে কলকাতায় বরফ চালান দিত। সেই বরফ সংগ্রহ করার জন্য বিশেষ করে ধনীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। কলকাতায় সেই বরফ মজুত করবার জন্য বিচিত্র ধরনের একটি বাড়ি তৈরী করা হয়েছিল। সেখান থেকে তিন আনা সের দরে বরফ বিক্রি হতো। তাছাড়া রকমারি ধরনের সরাই বা কুঁজোতে জল ঠাণ্ডা করা হতো।

তখনও কলকাতায় কয়লার বড় একটা চলন হয়নি। কয়লা-খনি প্রথম আবিষ্কৃত হয় বর্ধমান জেলায় ১৮০৪ সালে। কিন্তু পরবর্তী বারো বছরে এ-নিয়ে বিশেষ কোন উচ্চবাচ্য হয়নি। বাষ্পীয় জাহাজ চালাবার প্রয়োজনেই শেষ পর্যন্ত ভূগর্ভস্থ এই সম্পদ কাজে লাগাবার

চেষ্টা হয়। এই তাগিদেই ১৮৩৭ সালে খনিজ সম্পদ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়। তারা ৪০টি স্থানে কয়লা খনির সন্ধান পায়। কয়লার দাম তখন ছিল নয় আনা মণ। রান্না-বান্না তখন কাঠের আঁচেই হতো। কাঠের বাজার বসতো কলকাতার পূর্বাঞ্চলের খালের পাড়ে। টাকায় চার-পাঁচ মণ কাঠ পাওয়া যেত।

তখন কলকাতায় সাহেব সুবোদের জন্য রকমারী জিনিসপত্রের দোকান ছিল বারোটি, মদের দোকান পঁচিশটি, ওষুধের দোকান পাঁচটি, আসবাবপত্রের দোকান পাঁচটি, রুটি-কেক-বিস্কুট ইত্যাদির কারখানা চৌদ্দটি, লোহালক্কড়ের দোকান একটি, দরজির দোকান নয়টি, জুতোর দোকান তেরটি, মেয়েদের পোশাকের দোকান নয়টি, চুল ছাটাইয়ের দোকান চারটি আর চামড়ার দোকান পাঁচটি। কলকাতার দুটি বড় হোটেলেও রুটি, কেক ইত্যাদি পাওয়া যেত। এছাড়া নতুন ও পুরনো চীনে বাজারে দেশীয়দের কয়েকটি বড় দোকান ছিল।

কসাই টোলায় (বর্তমান বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট) ইওরোপীয় ব্যবসাদারেরা তখন কিছুটা আভিজাত্য আনবার চেষ্টা করছিল। জনৈক ইওরোপীয়ান তো কভেন্ট গার্ডেন বা ফ্লিট মার্কেটের অনুকরণে একটি কসাইয়ের দোকান খুলে বসেছিল। কিন্তু দোকানটা কিছুকাল পরেই উঠে যায়।

কসাইটোলায় তখন চীনেদের গোটা পঁচিশেক জুতোর দোকান ছিল। মেয়েদের এবং শিশুদের সুদৃশ্য জুতো তৈরীতে তারা তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। প্রাচ্য দেশীয় কারিগরদের মধ্যে চীনেরাই সেরা। চীনে মুচিরা শুধু শ্রমিকই ছিল না। তাদের মধ্যে শ্রমশীলতা, সাধুতা, পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাধীন মনোবৃত্তির এমন একটা ছাপ ছিল যে সহজেই তারা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত। তাদের অনেকের দোকানে কাচের শো কেস ছিল। অনেকের ব্যবসায় এত বড় ছিল যে, তারা দু-তিনজন করে বাঙালি কর্মচারী রাখত।

এ-ছাড়া এখানে-সেখানে ছুটকো-ছাটকা আরও কিছু দোকান ছিল। এগুলিকে বলা যেতে পারে জাল আর ভেজাল মালের ডিপো।

এখানে বিলেতি ছাপ দিয়ে দেশী নিরেস মাল বিক্রি হতো। মদ, বিয়ার, আচার, গন্ধদ্রব্য ইত্যাদির ব্যাপারেই ভেজাল চলত বেশী। অনেক ক্ষেত্রে লেবেল শিশি ইত্যাদি এমনভাবে জাল করা হতো যে খাদা চোখে তা ধরাই যেত না। কিছু দেশী জিনিস আবার বিলেতি ছাপ দিয়ে বিক্রি করা হতো শুধু এই কারণে যে লোকে দেশী জিনিস কিনতে চাইত না যদিও এসব জিনিস বিলেতি মাল থেকে মোটেই নিরেস ছিল না।

মাছ মাংস তরিতরকারী ইত্যাদির জন্য সাহেবদের বাজার ছিল টিরেটা বাজার আর জ্যাকসনের বাজার। খাদ্যশস্যের বড় বাজার ছিল হাটখোলা অঞ্চলে।

চীনা বাজারের নাম কেন যে চীনা বাজার কে জানে! সরু সরু গলি—তার দু-পাশে বাঙালির হরেকরকম পণ্যের দোকান। এইতো চীনা-বাজার। বিছানা পাটি, জামা-কাপড়, হোসিয়ারী দ্রব্য, আয়না, মদ, বই, চীনে মাটির বাসনপত্র—এখানে না পাওয়া যায় কি!

কিন্তু প্রাচ্য দেশের সব মানুষকে যদি এক জায়গায় পেতে হয় তবে যেতে হবে বড়বাজারে।

কলকাতায় তখন যানবাহন ছিল ছয় প্রকারের। যথা, ইংরেজি রথ (English Chariot)। গবর্নর, জজ, ডাক্তার ইত্যাদি এই গাড়ি চড়তেন। বিকেলবেলা এতে চেপে গবর্নর, জজ, ডাক্তারদের তো বটেই—অন্যদের বাড়ির মেয়েরাও বেড়াতে বের হতেন। গ্রান্ট মন্তব্য করেছেন, দেখে শুনে মনে হয়, অনেকের গাড়ি মেয়েদের বেড়াবার জন্যই।

বেড়াবার জায়গা ছিল ফোর্ট উইলিয়মের সামনেকার স্ট্র্যাণ্ড। সন্ধ্যে ছটা থেকে সাতটা সেখানে পিঁপড়ের সারির মতো গাড়ি আর মানুষের ভিড় জমত।

সে সময়ে কলকাতায় এসপ্লানেডে একটি দর্শনীয় বস্তুর আবির্ভাব ঘটেছে সেটি একটি 'লণ্ডন ও ব্রাইটন' কোচ। লণ্ডনের ডক থেকে যে অবস্থায় গাড়িটা 'জেনোবিয়া' জাহাজে উঠেছিল সেই অবস্থাতেই নেমেছে

কলকাতায়। বিলেতের রাস্তার ধুলো-কাদা মাখা ছিল গাড়ির চাকায়—তা ধুয়ে ফেলাটাও পাপ মনে হয়েছে।

তৃতীয় ধরনের গাড়ির নাম পাল্কি গাড়ি। ব্রাউনবেরি পাল্কি গাড়িরই আর একটা সংস্করণ। বস্তুতপক্ষে, এই গাড়িগুলি চাকার উপর বসানো পাল্কি ছাড়া আর কিছুই নয়।

শোনা যায় ১৮২৮ সালে ওড়িয়া পাল্কি বেহারাদের একটা সাধারণ ধর্মঘট হয়েছিল। এই ধরনের গাড়ির প্রবর্তন সেই সময়ে! তখনকার দিনে পাল্কি বেহারাদের নিয়ন্ত্রণ করবার মতো কোন আইন ছিল না। অনেক সময় তারা যাত্রীদের উপর জোর জুলুম করত। অবস্থার প্রতিকারের জন্য সাধারণের পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানানো হয়। তার ফলে পাল্কি বেহারাদের উপর কতকগুলি বিধি-নিষেধ জারী হয়। আদেশ হয় পাল্কিতে নম্বর দিতে হবে এবং বেহারাদের হাতে পরতে হবে নম্বর দেওয়া পেতলের চাকতি। বেহারারা বলে, নম্বর পরলে তাদের জাত যাবে। কিন্তু তাদের আপত্তিতে কর্ণপাত করা হয় না। বেহারারা তখন কর্মত্যাগ করে এস্প্লানেডে এসে সমবেত হয়। বলে তা তারা একযোগে দেশে ফিরে যাবে। এদিকে যান বাহনের অভাবে শহরে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

এই সময় কলকাতায় ব্রাউনলো নামে এক ভদ্রলোক বাস করতেন। তাঁর নজস্ব একটা পাল্কি ছিল। কিন্তু বেহারার অভাবে তা অচল। শেষে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে তিনি একদিন সেই পাল্কিতে চারটে চাকা জুড়ে ঘোড়া জুতে—তাতে চেপে আপিসে গিয়ে হাজির হলেন। সেই থেকে, এই গাড়ির চল। মিঃ ব্রাউনলোর নাম অনুসারেই এই গাড়ির নাম হয়েছে ব্রাউনবেরি।

পঞ্চম ধরনের গাড়ির নাম বগি গাড়ি। ইংলণ্ডের মতই তখন এ গাড়ির চলন হয়েছে কলকাতায়।

তা ছাড়া ছিল পাল্কি। পাল্কির অবশ্য রকমফের ছিল।

বগি বা পাল্কি গাড়ির তুলনায় পাল্কিতে খরচ বেশি পড়ত। পাল্কি

বেহারার মাসিক মাইনে ছিল— রওআনি হলে চার টাকা আর ওড়িয়া হলে পাঁচ টাকা। রওয়ানি বেহারা রাখতে হতো পাল্কি পিছু ৬'জন, ওড়িয়া বেহারা পাঁচ জন। সুতরাং হবেদরে খরচ সমানই পড়ত।

তখন সবে হাওড়া-রাণীগঞ্জ (১২১ মাইল) রেল লাইন বসেছে। দুটো স্টিমার সার্ভিস চালু হয়েছে গঙ্গায়। ইণ্ডিয়া জেনারেল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি আর গ্যাঞ্জেস স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি ছিল এই দুটো সার্ভিসের কর্তা।

স্থলপথে কলকাতার বাইরে যেতে হলে গবর্ণমেন্টের ডাক বা ইনল্যাণ্ড ট্রানজিট কোম্পানির শরণ নিতে হতো। ডাক যেত পাল্কিতে। প্রতি আট মাইল অন্তর বেহারা বদল হতো। সারা দিন সারা রাত ধরে পাল্কি চলত। ইনল্যাণ্ড ট্রানজিট কোম্পানির চার চাকার গাড়ি ছিল। প্রথম দিকে গাড়ি এমনভাবে তৈরি করা হতো যে দরকার হলে, অর্থাৎ, রাস্তা না পাওয়া গেলে বা রাস্তার অবস্থা খারাপ হলে গাড়িটি চাকা থেকে খুলে পাল্কি হিসেবে ব্যবহার করা চলত। যাদের তাড়াহুড়ো থাকত না, সঙ্গে লটবহর থাকত তারা অবশ্য নৌকাযোগেই ভ্রমণ করত।

ডাকের পাল্কি বেশ জোরে চলত। কলকাতা থেকে এলাহাবাদ —৫১৪ মাইল পথ—সাতদিনে চলে যেত। তবে পাল্কিতে জায়গা পেতে হলে পাঁচ দিন আগে বন্দোবস্ত করতে হতো আর খরচ পড়ত ২৫৭ টাকা।

তখনকার দিনে সাহেব-সুবোদের গণ্ডা-গণ্ডা ভৃত্য থাকত। গ্রাণ্টের বইতে এই ভৃত্যরাজতন্ত্রের বিশদ বর্ণনা আছে। এখানে তার একটু সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিচ্ছি।

ভৃত্যকুলশিরোমণি ছিল খানসামা। গ্রাণ্ট লিখেছেন, কেউ খানসামা হয়ে জন্মায়, কেউ কর্মবলে খানসামাত্ব অর্জন করে, আবার কারুর উপর খানসামাত্ব আরোপিত হয়। ভৃত্যকুলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সে। মাইনে ৮ থেকে ২৫ টাকা। তবে উপরি আছে। বাজারের ভার তার উপর। দোকানীর কাছ থেকে সে দস্তুরী পায়, কর্তার

পয়সা থেকেও কিছু কমিশন রাখে।

ভৃত্যরাজকতন্ত্রের কৌলীন্যের দিক থেকে খানসামার পরেই স্থান খিদমদগারের। খিদমদগারের কাজ রান্না ঘর থেকে খাবার নিয়ে আসা ও পরিবেশন করা। যে বাড়িতে চাকর-বাকর কম সে বাড়িতে অবশ্য অন্য কাজও তাকে করতে হতো। এদের মাইনে ছিল ছয় থেকে দশ টাকা। এদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল খানসামা হওয়া।

খানসামার পরই নাম করতে হয় বাবুর্চির। বাবুর্চিরা মুসলমান, পর্তুগীজ, মগ কিংবা নিম্নবর্ণের কাওরা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। এরা রাঁধত ভালো। এদের মাইনে ছিল ছয় থেকে বারো টাকা।

মশালচীর কাজ ছিল রাত্রিবেলা মশাল নিয়ে পথ দেখানো। কিন্তু সে কাজ রোজ করতে হয় না। অন্য সময় সে বাসনপত্র ধোয়া-মোছা করত। মাইনে ছিল চার টাকা।

বেয়ারারা সাধারণত হিন্দু ছিল। সাহেব বাড়িতে পরিবেশন বা বাসন ধোয়ার কাজ তারা করত না—তাতে তাদের জাত যেত। এদের কি কাজ হবে তা নির্ভর করত প্রভুর সামাজিক মর্যাদার উপর। এরা আসবাবপত্র পরিষ্কার রাখত, ঘরদোর গোছগাছ করত, প্রভুর জামা-কাপড়ের হদিশ রাখত। মাইনে ছিল ছয় থেকে দশ টাকা।

দারোয়ানের কাজ ছিল পাহারা দেওয়া। এ ছাড়া মেথর-মেথরানী, আয়া, ধোবী, ভিস্তিওয়ালা, দরজী, হুকাবরদার, চাপরাশী, হরকরা, পেয়াদা, পিওন ইত্যাদিরও সচিত্র পরিচয় এই বইতে আছে।

গ্রান্ট তাঁর বইতে বাঙলার শাক-সব্জি, ফলমূল ও গাছ-পালার যে সচিত্র বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তা এত নিখুঁত যে দক্ষ বটানিস্টও হার মেনে যাবেন। তাঁর দৃষ্টি যে কত তীক্ষ্ণ ছিল এবং কত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যে তিনি বাঙলাদেশকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন—এ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রান্টের ভাষা এত সহজ ও সরল ছিল যে মনে হবে তা যেন আজকের দিনের কারোর রচনা।

অ্যা টি কি ন স ন

আঠেরো শতকের বাঙালীদের জীবনযাত্রার বিবরণ রেখায় পটে ধরে রেখে গিয়েছেন বেলজিয়ান শিল্পী বল্ট সলভিন। উনিশ শতকের কলকাতা এবং কলকাতার ইংরেজ বাসিন্দাদের অন্তরঙ্গ পরিচয় বিধৃত স্যার চার্লস ডয়েলির ছবির অ্যালবামে। ইংরেজ শিল্পী অ্যাটকিনসন এসেছিলেন আরও কিছু পরে—তাঁর ছবিরও বিষয়বস্তু ছিল ভারত-প্রবাসী ইওরোপীয়দের জীবনযাত্রা। তবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল কিছুটা তির্যক এবং তাঁর ছবিগুলি কার্টুনধর্মী। কিন্তু একটু অতিশয়োক্তি থাকলেও তাঁর ছবির বইতে সেকালের ইওরোপীয়দের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহারের এমন একটা প্রাণোচ্ছল বর্ণাঢ্য চিত্র পাওয়া যায়—ইতিহাসের উপাদান হিসাবে যার মূল্য নগণ্য নয়।

অ্যাটকিনসন অবশ্য শিল্পী হিসাবে এদেশে আসেননি। স্যার ডয়েলির মতো তিনিও ছিলেন সখের শিল্পী। স্যার ডয়েলি ছিলেন সিভিলিয়ান আর জর্জ ফ্রাঙ্কলিন অ্যাটকিনসন বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ার্স বাহিনীর ক্যাপ্টেন।

সে সময়ের কথা হচ্ছে, তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির

ভারত-সাম্রাজ্য বাঙলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিনটি প্রেসিডেন্সীতে বিভক্ত ছিল। কার্যব্যপদেশে তিনটি প্রেসিডেন্সীতেই ভ্রমণ করেছিলেন অ্যাটকিনসন। তিন অঞ্চলেই সাহেব-সুবোদের জীবনযাত্রা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। পেশা না হোক, ছবি আঁকার নেশা ছিল—সে অভিজ্ঞতাকে তিনি কৌতুক-রসে অভিষিক্ত করে রঙে-রেখায় সঞ্জীবিত করে তুলেছিলেন।

ভারত-বিষয়ক তিনখানি ছবির অ্যালবামের সন্ধান পাওয়া যায় অ্যাটকিনসনের: কারি অ্যাণ্ড রাইস, দি ক্যাম্পেন ইন ইণ্ডিয়া (১৮৫৭ ৫৮) ও ইণ্ডিয়ান স্পাইসেজ ফর ইংলিশ টেবল।

ইণ্ডিয়ান স্পাইসেজ ফর ইংলিশ টেবল-এর নামপত্রে বইটির বিবরণ দেওয়া হয়েছে:

Rare relish of fun from the Far East, being the adventures of Our Special Correspondent in India. (দূর প্রাচ্য থেকে রঙ্গরসের দুর্লভ সম্ভার: আমাদের ভারতস্থিত বিশেষ সংবাদদাতার অভিজ্ঞতার বিবরণ)।

এক ইংরেজ তনয় সদ্য কলকাতায় পা দিয়ে কি রকম নাজেহাল হয়েছিল ১২০টি কৌতুক রসাত্মক স্কেচের মাধ্যমে তার হাস্যকর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন অ্যাটকিনসন। অ্যালবামটিতে সেকালের যান-বাহনের কিছু প্রামাণ্য ছবি পাওয়া যায়।

দি ক্যাম্পেন ইন ইণ্ডিয়ার (১৮৫৭-৫৮) বিষয়বস্তু ভারতীয় মহাবিদ্রোহ, ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা যার নাম দিয়েছিলেন সিপাহী বিদ্রোহ।

কিছুকাল আগে মহাবিদ্রোহের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। এতদুপলক্ষে বিদ্রোহের ইতিহাস নিয়ে নতুন করে কিছু আলোচনা হয়েছে। এখানে তার পুনরাবৃত্তি না করলেও চলবে। বিদ্রোহীরা ১১ মে দিল্লি দখল করে। শহরটি প্রায় পাঁচ মাস কাল বিদ্রোহীদের হাতে ছিল। ইংরেজরা ভারতবর্ষের নানা জায়গা থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে শাদা-চামড়া ও অনুগত দেশী সৈন্যদল দিল্লির সামনে জড়ো

করে। প্রচণ্ড এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর বিদ্রোহীরা পরাজিত হন। শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ্ ইংরেজদের হাতে বন্দী হন। প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করে তাঁর দুই পুত্রকে কাপুরুষের মতো হত্যা করে ক্যাপ্টেন হডসন। বিজয়ী ইংরেজ সৈন্যদল অবাধে দিল্লি শহরে লুঠপাট চালায়।

অ্যাটকিনসন সম্ভবত দিল্লি অবরোধকারী ইংরেজ সৈন্যদলের সঙ্গে ছিলেন। দি ক্যাম্পেন ইন ইণ্ডিয়াতে ২৬টি ছবির মধ্যে অ্যাটকিনসন ভারতীয় ইতিহাসের এই রক্তাক্ত অধ্যায়টিকে জীবন্ত করে রেখেছেন। অ্যালবামটির প্রকাশকাল ১৮৬০। রানী ভিক্টোরিয়ার অনুমতিক্রমে অ্যালবামটি তাঁকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। এই সিরিজের ২৫ খানি জল রঙের মূল ছবি কলকাতার ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধে রক্ষিত আছে।

সন্দেহ নেই অ্যাটকিনসন মহাবিদ্রোহকে ইংরেজের দৃষ্টি দিয়ে বিচার করেছেন এবং সচেতনভাবে ইংরেজের কোলে ঝোল টেনেছেন। উৎসর্গপত্রে তিনি বিদ্রোহীদের অনুতাপহীন বিশ্বাসঘাতী বিদ্রোহী শত্রু (remorselessly treacherous rebellious foe) বলে বর্ণনা করেছেন এবং 'স্বল্পসংখ্যক দৃঢ়সংকল্প অনুগত ব্যক্তির উৎসর্গিত প্রাণ বীরত্বের' গুণগান করেছেন। তিনি বিদ্রোহীদের 'পৈশাচিক নির্মমতার' কথা শতকণ্ঠে বলেছেন। তাঁর ছবির অ্যালবাম কিন্তু এই উৎসর্গিত প্রাণ মহাবীরদের রক্তপিপাসু চেহারাই স্পষ্ট করে তুলে ধরে—যদিও অ্যাটকিনসনের সচেতন লক্ষ্য ছিল অন্য। সে লক্ষ্য—অ্যাটকিনসনের ভাষায়, 'আমাদের বীর সৈন্যরা স্বদেশের সম্মান এবং রানীর প্রতি ভালোবাসার জন্য কি করেছিল, তার কিছুটা আভাস' সম্রাজ্ঞীকে দেওয়া।

অ্যাটকিনসনের অঙ্কনরীতি হয়ত নিখুঁত নয়, কিন্তু দিল্লি অবরোধের সমসাময়িক দলিল হিসাবে এই অ্যালবামটির মূল্য অসীম।

অ্যাটকিনসনের অ্যালবামগুলির মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ এবং সামাজিক ইতিহাসের দলিল হিসাবে সবচেয়ে মূল্যবান 'কারি অ্যাণ্ড রাইস'।

'কারি অ্যাণ্ড রাইস' ডাল-ভাতের রন্ধন-প্রণালী নয়—ডাল-ভাতের দেশে, অর্থাৎ ভারতবর্ষে সে-কালের সাহেব-সুবোরা কেমনভাবে জীবন-যাপন করতেন বইটিতে তার সচিত্র বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন অ্যাটকিনসন।

মুখবন্ধে একটি স্বরচিত কবিতায় অ্যালবামটি প্রকাশের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে অ্যাটকিনসন লিখেছেন :

Whist I show in what style Anglo-Indians exist.

In Her Majesty's Eastern Dominions.

'কারি অ্যাণ্ড রাইস'-এ চল্লিশখানা ছবি আছে। এই ছবিগুলিও কার্টুনধর্মী। এই অ্যালবামে ভারত-প্রবাসী ইংরেজদের জীবনযাত্রাকে অ্যাটকিনসন দেখেছেন বাঁকা চোখে, তাঁদের আচার-আচরণের অসঙ্গতিকে বড় করে দেখিয়েছেন। কিন্তু তার মধ্যে কোনো বিদ্বেষ না থাকায় ছবিগুলিতে অনাবিল কৌতুক রসেরই প্রাধান্য।

নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর সপক্ষে অ্যাটকিনসন লিখেছেন : "মনুষ্যসমাজে যারা ত্রুটিবর্জিত তাদের নিয়ে রঙ্গরস করার সুযোগ নেই। ত্রুটিহীনতা কৌতুকরস বর্জিত। পূর্ণতার অভাব ঘটলে তবেই মানুষকে নিয়ে কৌতুক করা যায়। নিখুঁত গোল যে চাকা তা ধুরোর চারপাশে মসৃণভাবে ঘুরতে থাকে। তাই তা আমাদের চোখ টানে না। কিন্তু যে চাকা তেড়াবেঁকা, মনে হয় এক্ষুনি খুলে বেরিয়ে আসবে, যা থেকে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হয় তাই সহজে আমাদের চোখকে টানে, মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলে।

"কাজেই আমার যে সব পাঠকেরা মনে করছেন আমি স্বজাতির আচার-আচরণের অসঙ্গতি, দোষত্রুটিকে বিচ্ছিন্ন করে তুলে ধরেছি, আশা করি এর পর তাঁরা আমার এই কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হবেন যে আমার উদ্দেশ্য পূর্ণতার প্রতিকৃতি রচনা নয়, আমার উদ্দেশ্য ভারতীয় জীবনযাত্রার হাস্য-কিরণোজ্জ্বল দিকটিকে উদ্ভাসিত করে পাঠকদের আনন্দ বিধান করা।"

শুধু ছবি নয়, ছবির সঙ্গে যে বর্ণনা আছে তাতেও অ্যাটকিনসনের কৌতুকপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। ভূমিকায় যদিও তিনি বলেছেন তাঁর ছবির বিষয়বস্তু প্রধানত বাঙলা অঞ্চল থেকে আহরিত, পরে কিন্তু তিনি তাঁর বর্ণিত অঞ্চলটিকে 'কাবাব' বলে অভিহিত করেছেন।

এই 'কাবাব' স্থানটি কোথায়? অ্যাটকিনসন তাঁর ভৌগোলিক অবস্থানেরও নির্দেশ দিয়েছেন। কাবাব গ্রামটি অবস্থিত বাবুর্চির প্রদেশে, ডেকচির সমতলভূমিতে। সভ্যতনিয়ার কর্মব্যস্ততা থেকে দূরে মনোরম এই গ্রামটি। অ্যাটকিনসনের মনে সন্দেহ: স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তবে সে এইখানে, এই কাবাব গ্রামে। যদিও কাবাব কোনো প্রদেশের রাজধানী নয়, যদিও কেউকেটাদের ভিড় নেই এখানে, যদিও কোনো ইঞ্জিনের কর্কশ চিৎকার এখানকার প্রাচীন নৈঃশব্দ্যকে সচকিত করে না, তাতে ভয় পাবার কিছু নেই। গ্রেট লোহার রেলরোডের নির্মাণকার্য শুরু হয়েছে—অচিরেই এখানে ভ্রমণকারীদের ভিড় জমবে, প্রিয়ভূমি ইংলণ্ড থেকে আসবে নীলনয়না সুন্দরীরা, দামী দামী মদ আসবে—শস্তা দামে। সত্যিই কী সৌভাগ্য না অপেক্ষা করে আছে কাবাবের জন্য!

কাবাবের জীবনযাত্রার বিশদ বর্ণনা এখানে এই স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই কাবাবের জীবনযাত্রার বর্ণনা থেকে কয়েকটি নির্বাচিত অংশ সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে পরিবেশন করছি।

প্রথমে কাবাবের বাজারটাই ঘুরে দেখা যাক। কাবাবের পশ্চিম অঞ্চলে দেশীয়দের বস্তি। কতগুলি কাদামাটির বাড়ি পরস্পরকে ভ্রূকুটি করে। মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সরু সরু এঁদো গলি। এই গলিগুলি কাবাব বাজারকে দ্বিখণ্ডিত, ত্রিখণ্ডিত, চতুর্খণ্ডিত করে। বাজারে অন্তত তিনটি চকমেলানো বাড়ি আছে। প্রত্যেকটি দোতলা। আহা কী তার গঠনসৌষ্ঠব! বাড়ির সামনে এমন সব রঙবেরঙের রঙ-চঙানো, জীবজন্তুর ছবি আছে যে দেখা মাত্রই তাক লেগে যাবে। কনট্রাক্টর চাউস লাল আর বনিয়া দাস এই বাড়িতে থাকে। নিচে

দোকান-ঘরে বসে হুঁকো টানছে তাদের কর্মচারীরা। দোকানে রকমারী শস্যসম্ভার পথচারীকে উন্মনা করে। একটা বিশালকায় ষণ্ড তুষ্টভাবে ঘ্রাণ নিচ্ছে। এই মাত্র ঐ সব উপাদেয় খাদ্যসম্ভারে সে ক্ষুন্নি-বৃত্তি করেছে এবং যথারীতি তার জন্য তার মোটা চামড়া কয়েক জায়গায় কাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। উল্টো দিকে একটা মিঠাইয়ের দোকান। আমাদের নোলায় জল ঝরাবার মতো কেক-পেস্ট্রি তাতে নেই বটে, কিন্তু যা আছে তার তীব্র কটু গন্ধ ছুটো অপোগণ্ড ছোকরার নোলায় জল এনেছে। এক হিন্দুস্থানী রমণী তো পয়সা বার করছে ঐ রসনা লোভন মণ্ডা কিনবে বলে।

কাবাব গ্রামে একটি কফিখানা আছে। সকাল বেলা ঘোড়ায় চড়া অভ্যেস করা বা কুচকাওয়াজের পর সবাই এসে সেখানে জড়ো হয়। গরম পানীয় সহযোগে ক্লান্ত দেহকে একটু বিশ্রাম দেয়। কেউ খবরের কাগজ পড়ে, গল্পগুজব করে কেউবা। ভাবের আদান-প্রদান হয়। তাতে ক্লান্তিকর একঘেয়েমী থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কফিখানায় পরচর্চায় একেবারেই উৎসাহ দেওয়া হয় না। কিন্তু হলে কি হবে, অনেকেরই ধারণা, বিশেষ করে মেয়েদের—এই জঘন্য কফিখানাটায় লোকের দুর্বলতা, বিশেষ করে মেয়েদের দুর্বলতা নিয়ে রীতিমত চর্চা করা হয়। তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ত্রুটিবিচ্যুতির উপর এমন ঘন করে রঙের পোচ চাপান হয় যে, সত্যের সম্পূর্ণ অপলাপ ঘটে। এগুলি নিতান্তই নিন্দুকের অপবাদ। তবে হ্যাঁ, সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে হয়—দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনার মধ্যে পারিবারিক আলোচনাও মাঝেসাঝে উঠে পড়ে। যেমন ধরা যাক গ্যাণ্ডারের বাড়ির ভোজের কথা এখানে আলোচিত হয়েছে। কথাপ্রসঙ্গে একজন বলল শুয়োরটার কিঞ্চিৎ বয়স হয়েছিল। ওটাকে কিছুকাল আগে নর্দমার মধ্যে পড়ে থাকতে দেখা গেছে, বলল আরেকজন। তখন পারসিক বলল, জনৈক দেশীয়কে, সে গ্যাণ্ডারের বাড়ি মাংস বিক্রি করতে দেখেছে। আর একজন বলল, টার্কিটা নিতান্তই শিশু ছিল,

মুরগীর মাংস দিয়ে তার কলেবর বৃদ্ধি করা হয়েছে। 'তাহলে দেখুন, আমাদের কফিখানায় পরনিন্দা মোটেই করা হয় না—যা অবিসম্বাদি সত্য, তাই শুধু আলোচনা করা হয়। এই ভাবে কফি, চুরুট, কিংবা হয়ত বিলিয়ার্ড সহযোগে আমাদের সময় বেশ কেটে যায়···।'

ক্যাবারে মাঝে মাঝে থিয়েটারও হয়। দেবী থেসপিসের ভক্তরা দর্শকদের আনন্দ বিধানের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে না।

সভাঘরের একদিকে স্টেজ বাঁধা হয়েছে। সিনসিনারি এঁকে দিয়েছে জনৈক উচ্চাভিলাষী ছোকরা।···কিন্তু না এইবার পর্দার ভেতরে উঁকি মারা যাক। ব্যাণ্ড বেজে উঠেছে। লোকজন এসে গেছে। নাট্যে দল অনেক উত্তেজনা, দাপাদাপির পর এখন নাটক নিয়ে পড়েছে। প্রম্পটার আশ্রয় নিয়েছে সবুজ পর্দার পেছনে। পর্দা উঠল। নাটক শুরু হল। নাটক জমে উঠেছে। মর্মস্পর্শী দৃশ্য সব। দর্শকদের চিত্ত-চাঞ্চল্য। ঘন ঘন রুমালের দরকার হচ্ছে। কাহিনীর রস ঘনীভূত হয়েছে। চরম মুহূর্ত এসে পড়েছে। নায়ক সেজেছে চায়ুচ। হৃদয়বিদারক একটি দৃশ্য। কিন্তু চায়ুচ পার্ট ভুলে গেছে। অস্বস্তির সীমা নেই তার। উইংস ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে সে। প্রম্পটারকে অনুনয় করছে চোখের ইশারায়।

'কাঁদো' ফিস ফিস করে বলে প্রম্পটার।

'কি ? কি ?'

'কাঁদো। কাঁ-া দো।' গলা একটু একটু করে চড়িয়ে বলে প্রম্পটার।

'কি ? কি বলছ কি মাথামুণ্ডু ? জোরে বল।'

এবার প্রম্পটার গলা সপ্তমে চড়িয়ে চিৎকার করে ওঠে 'কাঁদো'

অভিনেতার সকরুণ কাকুতি আর প্রম্পটারের বাজখাঁই জবাব স্পষ্টভাবে দর্শকদের কানে গেছে। প্রেক্ষাগৃহে হাসির হল্লোড়। কিন্তু চায়ুচ তাতে একটুও দমে যায় না। দর্শকদের দিকে মুখ করে সে তখন ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করেছে।

প্রায় হুতোমি ধরনের এই রকম অসংখ্য টুকরো টুকরো ছবি 'কারি অ্যাণ্ড রাইসের' পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। অ্যাটকিনসনের তুলি কতটা শক্তিশালী ছিল তা নিয়ে হয়ত মতভেদ ঘটবে, কিন্তু তাঁর কলম যে বিলক্ষণ ধারালো ছিল তাতে সন্দেহ নেই। একশ বছর আগেকার রচনা হলেও, 'কারি অ্যাণ্ড রাইসের' ভাষা বেশ সহজ, সরল এবং সর্বোপরি প্রসাদ গুণসম্পন্ন।

সলভিন্স

আঠারো শতকের বাঙালীর জীবনযাত্রা কি রকম ছিল, কেমনভাবে তারা অবসর যাপন করত, কেমন ছিল তাদের পোশাক-আশাক, আচার-আচরণ; তাদের পাল-পার্বণের ধরনই বা ছিল কি রকম—খুঁজে দেখলে হয়তো সেকালের পুঁথিপত্তরে তার কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যাবে। কিন্তু পুঁথি ঘেঁটে যা জানা যায়, তা হচ্ছে পরোক্ষ জ্ঞান। আর কথায়ই আছে—চোখে দেখার চেয়ে বড় জানা আর কিছু নেই।

কিন্তু 'টাইম-মেশিন' এখনও বৈজ্ঞানিক-কল্পনাবিলাস মাত্র—অতীতে ফিরে যাবার সত্যি কোনো উপায় নেই। সেকালে ক্যামেরাও ছিল না। আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবনযাত্রা চোখে দেখতে হলে তাই আঁকা ছবির শরণ নেওয়া ছাড়া গতি নেই। কিন্তু তেমন ছবি কে এঁকেছেন? এ প্রশ্নের জবাবে যে নামটি সবার আগে মনে পড়ে তা হচ্ছে—সলভিন্স।

সত্যি, সলভিন্সের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। আঠারো শতকের বাঙালীর জীবনযাত্রাকে তিনি যে-রকমভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং রেখায় পটে বন্দী

করে রেখে গিয়েছিলেন, আর কোনো ইওরোপীয়ান তো নয়ই, কোনো ভারতবাসীও তা করেছেন কি না সন্দেহ।

সলভিন্সের ছবির শিল্পমূল্য হয়তো যৎসামান্য, কিন্তু সেকালের মানুষের জীবনযাত্রার প্রামাণ্য চিত্র-রূপায়ণ হিসাবে তার মূল্য অপরিসীম। তাঁর মৃত্যু সংবাদ দিতে গিয়ে 'দি ক্যালকাটা গবর্নমেন্ট গেজেট' (১৮ই মে, ১৮২৬) সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছিল: "তাঁর স্কেচগুলি যদিও খুব সুন্দর নয় কিন্তু সেগুলি অত্যন্ত বিশ্বস্ত চিত্র-রূপায়ণ। তিনি নিশ্চয়ই অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং পর্যবেক্ষণশীল গবেষক ছিলেন। তাঁর নিজ হাতে করা এনগ্রেভিংগুলি, যা তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশ করেছিলেন, সেগুলি একেবারেই সুষমাবর্জিত। কিন্তু তাহলেও পাশ্চাত্ত্য দেশে সেগুলির খুবই চাহিদা। আমরা একটি দৃষ্টান্ত জানি যখন তাঁর একখানি অ্যালবামের জন্য ১০০ গিনি মূল্য দেওয়া হয়েছে। তারপর অনেককাল কেটেছে, কিন্তু সলভিন্সের ছবির দাম বেড়েছে বই কমেনি। আমি শুধু অর্থমূল্যের কথাই বলছি না।"

ফ্রাঁসোয়া বলথাজার সলভিন্স জাতিতে ছিলেন বেলজিয়ান। জন্ম ১৭৬০ সনে অস্তয়ার্পে। খুব ছেলেবেলাতেই নৌচিত্রকলায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন তিনি। অস্তয়ার্প আকাদেমির পুরস্কারও পেয়েছিলেন কয়েকবার। এই সময়ই তিনি আর্চ ডাচেস মারিয়া ক্রিস্টিনার নজরে পড়েন এবং তাঁরই দৌলতে জিলে প্রাসাদের ক্যাপ্টেন নিযুক্ত হন। পরে ল্যাকেন কাসেলেও অনুরূপ পদ পেয়েছিলেন সলভিন্স। চাকুরিটা খুবই অর্থকরী ছিল।

কিন্তু এ-রকম মসৃণ জীবনযাত্রা সলভিন্সের ভাগ্যে ছিল না। দেশে হঠাৎ বিপ্লব উপস্থিত হলো। সলভিন্সের পেট্রন আর্চ-ডাচেসকে আশ্রয় নিতে হলো অস্ট্রিয়ায়। সলভিন্স তাঁর অনুগমন করলেন। আর্চ-ডাচেসের মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন তিনি। তারপর স্যার হোম পপহ্যামের সঙ্গে বিদেশ যাত্রা করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া ক্যালেণ্ডার থেকে

জানা যায়, সলভিন্স ভারতবর্ষে এসে পৌঁচেছিলেন ১৭৯১ সালে ল্য এট্রসকো জাহাজযোগে।

ভারতবর্ষে আসার পর সলভিন্সের কার্যকলাপের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৭৯২ সনের ২৬ এপ্রিল সংখ্যা 'ক্যালকাটা গেজেট'-এ। টিপু সুলতানকে পরাজিত করে কলকাতায় এক বিজয় উৎসবের আয়োজন করেছিলেন কর্নওয়ালিস। গভর্নরের প্রাসাদ এতদুপলক্ষে স্মারক ছবি ও আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়েছিল। 'মাত্র দু'দিনের মধ্যে' সলভিন্স গভর্নরের প্রাসাদ সাজাবার জন্য একখানি ছবি এঁকে দিয়েছিলেন। পরের বছরও ঐদিনে অনুরূপ একটি স্মারক উৎসবের আয়োজন করা হয়। 'ক্যালকাটা গেজেট'-এ দেখি, এবারেও সলভিন্স গভর্নরের বাড়ি সাজাবার জন্য অনেকগুলি ছবি এঁকে দিয়েছেন।

কিন্তু এ-ধরনের কাজ হামেশা পাওয়া যায় না। কাজেই জীবিকার জন্য এর উপর নির্ভর করা চলে না। তখনকার দিনে প্রতিকৃতি চিত্রণই ছিল চিত্রকলার সবচেয়ে অর্থকরী শাখা কিন্তু এই শাখাটির প্রতি সলভিন্সের বিশেষ কোনো প্রবণতা ছিল না—যদিও 'ক্যালকাটা গেজেট'-এর এক বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায় (২ অক্টোবর, ১৭৯৪) তিনি লর্ড কর্নওয়ালিস-এর একটি প্রতিকৃতি রচনা করেছিলেন। এটি একটি পেন্সিল স্কেচের এচিং। ভারতবর্ষে থাকাকালীন তিনি অন্তত একটি তৈলচিত্রও এঁকেছিলেন। এটির নাম 'বারিপুরের (বারুইপুর ?) দৃশ্য।' কিন্তু এগুলো তাঁর শখের কাজ। জীবিকার জন্য তিনি বেছে নিলেন এনগ্রেভিং-এর কাজ।

এই সময় অ্যানবেরি নামে একজন ইংরেজ ইঞ্জিনীয়ার কিছু দৃশ্যচিত্র এঁকেছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল, ঐগুলি তিনি বিলেত পাঠাবেন এনগ্রেভিং করার জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে উঠল না। ভদ্রলোক তখন সলভিন্সকেই এনগ্রেভার নিযুক্ত করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ-পরিকল্পনাও পরিত্যক্ত হয়। অ্যানবেরি নিজে ছিলেন সুদক্ষ চিত্রকর। মনে হয় সলভিন্সের কাজ তাঁর পছন্দ হয়নি।

সলভিন্স এতে না দমে গিয়ে এমন একটা পরিকল্পনায় হাত দিলেন যার জন্য অন্তত বাঙালীদের কাছে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি ঠিক করলেন, বাঙালীদের আচার-ব্যবহার, পোশাক-আশাক সম্পর্কে ২৫০ খানি রঙিন ছবির একখানি অ্যালবাম প্রকাশ করবেন। তখনকার দিনেও বিজ্ঞাপন দেবার রেওয়াজ ছিল। ১৭৯৪ সালে ১২ ফেব্রুয়ারি ক্যালকাটা গেজেট-এ এক বিজ্ঞাপন দিয়ে নিজের সংকল্পের কথা জানালেন সলভিন্স : বারোটি খণ্ডে অ্যালবামটি প্রকাশিত হবে। প্রতিটি ছবির দাম হবে এক সিক্কা টাকা।

পরিকল্পনাটি দুঃসাহসিকই বলতে হয়, বিশেষ করে একজন একক-শিল্পীর পক্ষে। তখনকার দিনে যানবাহনের সুব্যবস্থা ছিল না। অথচ দেশ ভালো করে ঘুরে না দেখে এ-কাজ সমাধা করা সম্ভব নয়। কাজেই সলভিন্স যে-সময়ের মধ্যে কাজটি শেষ করতে পারবেন ভেবে-ছিলেন তা পারেননি। বার কয়েক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রকাশনের তারিখ পরিবর্তন করতে হয় তাঁকে। অবশেষে প্রায় দু বছর পরে ১৭৯৬ সালের ২৪ নভেম্বর এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে সলভিন্স জানান যে, তাঁর কাজ শেষ হয়েছে, আগামী মাসে গ্রাহকদের কাছে ছবিগুলি পৌঁছে দেওয়া হবে কিন্তু এই প্রতিশ্রুতিও তিনি রক্ষা করতে পারেননি। অ্যালবামটি শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৯৯ সালে।

সলভিন্স শুধু যে স্কেচ এবং এনগ্রেভিংই নিজ হাতে করেছিলেন তা নয়, যে কাগজে অ্যালবামটি ছাপা হয়েছিল, তাও তিনি নিজ হাতে প্রস্তুত করেছিলেন।

১৭৯৯ সনে তিনি অ্যালবামটির একটি ব্যাখ্যামূলক তালিকাও প্রকাশ করেছিলেন। কলকাতার 'মিরর প্রেস'-এ এটি ছাপা হয়েছিল। প্রকাশনের তারিখ ১ জানুয়ারি।

সলভিন্সের অ্যালবাম আজকাল দুষ্প্রাপ্য। তার সব ছবি এখানে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই তাঁর ব্যাখ্যামূলক তালিকার একটি

সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দিচ্ছি :

অ্যালবামটির প্রথমভাগে আছে বাটটি ছবি, বাঙলা দেশের বিভিন্ন জাতি ও তাদের পেশা সম্বন্ধে। তাছাড়া ইওরোপীয়দের বাসগৃহের একটি চিত্র।

দ্বিতীয়ভাগে আছে ইওরোপীয়দের গৃহভৃত্যদের পঁয়ত্রিশটি ছবি। তাছাড়া দেশীয়দের বাসগৃহ ও মন্দিরের একটি ছবি—চিৎপুর থেকে নেওয়া।

তৃতীয়ভাগে ভারতীয় পুরুষদের পোশাকের আটটি ছবি। তাছাড়া একটি হিন্দুস্থানী নাচের দৃশ্য।

চতুর্থভাগে ভারতীয় নারীদের পোশাকের আটটি ছবি। তাছাড়া হাতি ও উটের ছবি।

পঞ্চমভাগে গাড়ি, ঘোড়া ও বলদের আটটি ছবি, সেই সঙ্গে চিৎপুরের উত্তরের একটি বাঙালী-অধ্যুষিত রাস্তার দৃশ্য।

ষষ্ঠভাগে নানা ধরনের পালকির আটটি এবং কালীঘাট মন্দিরের একটি ছবি।

সপ্তমভাগে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের দশটি ছবি। তাছাড়া গঙ্গায় বান ডাকার একটি দৃশ্য।

অষ্টমভাগে নানা ধরনের প্রমোদতরীর তেরটি ছবি এবং কলকাতার কালবৈশাখী ঝড়ের একটি দৃশ্য।

নবমভাগে মালবাহী নৌকার সতেরোটি ছবি এবং কলকাতার একটি বাঙালীপাড়ার দৃশ্য।

দশমভাগে নানা রকম হুঁকা ও ধূমপানের আটটি ছবি। তৎসহ চড়ক পূজার একটি দৃশ্য।

একাদশ ভাগে নানা প্রকারের বাদ্যযন্ত্রের ছত্রিশটি ছবি এবং কলকাতার একটি দৃশ্য।

দ্বাদশ ভাগে হিন্দুদের নানাবিধ উৎসব-পার্বণ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বাইশখানি ছবি।

সলভিন্সের পরিকল্পনা কত ব্যাপক ছিল এবং কত একাগ্র ছিল তাঁর সাধনা, এই তালিকা থেকেই পাঠকেরা তা আঁচ করতে পারবেন।

সলভিন্স হয়তো নিছক জীবিকার তাগিদেই এই কাজে হাত দিয়েছিলেন। ব্যাখ্যামূলক তালিকার ভূমিকায় প্রকারান্তরে তিনি তা স্বীকারও করেছেন। তিনি লিখেছেন : "আমি এই কাজে হাত দিয়েছি এই ধারণা থেকে যে, সৌন্দর্য ও অভিনবত্বের দিক থেকে ভারতবর্ষের যে-সব দৃশ্য ইওরোপীয়দের কাছে আকর্ষণীয়, তার চিত্র-রূপায়ণ বা ভারতবর্ষে যে-সব জাতি বসবাস করে তাদের আচার-ব্যবহারের বর্ণনামূলক ছবি জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। বিশেষ করে গ্রহণযোগ্য হবে তাঁদের কাছে, যাঁরা দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে বসবাস করেছেন। দেশে ফিরে যাবার পর এই ছবিগুলি তাঁদের যৌবনের স্মৃতি, তাঁদের এককালের অতি-পরিচিত দৃশ্যাবলী তাঁদের মনে পড়িয়ে দেবে। সেই সঙ্গে এই ছবিগুলির সাহায্যে হিন্দুস্থানের অধিবাসীদের চরিত্র, আচার-ব্যবহার, পোশাক আশাক, গৃহস্থালীর উপকরণ, উৎপাদন প্রথা, যুদ্ধ, জল ও স্থলপথের বিভিন্ন যানবাহন, ধর্মানুষ্ঠান, পাল-পার্বণ এবং তাদের দেশের দৃশ্য সংস্থান সম্পর্কে তাঁরা তাঁদের ইওরোপীয় বন্ধুদের অবহিত করতে পারবেন।"

সলভিন্সের ধারণা ব্যর্থ হয়নি। সেকালে তাঁর ছবি এতই সমাদৃত হয়েছিল যে, তাঁর দেখাদেখি ডয়েলি প্রমুখ অনেকেই ভারতীয়দের আচার-ব্যবহারের চিত্ররূপ দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের কারোর মধ্যে সলভিন্সের সমগ্রতা বা একাগ্রতার পরিচয় পাওয়া যায়নি।

শুধু অন্যেরা নয়, সলভিন্স নিজেই এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৭৯৫ সনে আর একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানান যে, এবারে তিনি দেশীয়দের মুখাবয়বের ৩০১টি রঙিন এচিং-এর একটি অ্যালবাম প্রকাশ করবেন। মাসে মাসে অকাতরে কাজ করে সমাপ্য এই অ্যালবামটির

প্রতি খণ্ডের দাম হবে ১৬ সিক্কা টাকা এবং পুরো সেটটির দাম ১৬৮ সিক্কা টাকা। গ্রাহকের অভাবে সলভিন্সের এই প্রচেষ্টা অবশ্য ফলবতী হয়নি। আগেকার অ্যালবামটি হাতে না পেয়ে নতুন করে আবার চাঁদা দিতে অনেকেই রাজী হয়নি।

কলকাতা থাকার সময়—অবশ্য সলভিন্স জীবিকার জন্য অন্য কাজও করেছেন। পুরানো ছবির পরিচর্যায় কাজ করে বেশ কিছু অর্থোপার্জন করেছিলেন। তাছাড়া কোচ প্রস্তুতকারক স্টুয়ার্টের কাছে পালকি চিত্রণের কাজও করেছিলেন কিছুদিন। যে-সে পাল্কী নয় অবশ্য —দেশীয় রাজা-রাজড়াদের পালকি-চিত্র করাই ছিল তাঁর কাজ। সলভিন্স চিত্রিত প্রথম পালকি দুটি কিনেছিলেন লর্ড কর্নওয়ালিস, মহীশূরের যুবরাজদের উপহার দেবার জন্য। প্রত্যেকটির দাম পড়েছিল ছ-সাত হাজার টাকা। এইভাবে প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করেছিলেন সলভিন্স। ইংরেজ শিল্পী বেইলি শিল্পী ওজিয়াস হমফ্রের কাছে যে-সব চিঠিপত্র লিখেছিলেন (১৭৯৫), তা থেকে জানা যায়, সলভিন্স প্রায় ৪০,০০০ টাকা জমিয়েছিলেন।

সলভিন্স কবে এদেশ ছেড়ে গিয়েছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। কিন্তু ১৮০৪ সালের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া রেজিস্টারে আর তাঁর নাম পাওয়া যায় না। সলভিন্স তাঁর অ্যালবামের পারী সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন, তিনি ভারতবর্ষে পনেরো বছর কাটিয়েছেন।

ইওরোপ-যাত্রাপথে স্পেনের উপকূলে জাহাজডুবিতে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন সলভিন্স। ছবিগুলি এবং কিছু নোট ছাড়া আর কিছুই বাঁচাতে পারেননি তিনি।

ইওরোপে ফিরে পারীতে এসে বসবাস করতে থাকেন সলভিন্স। ইতিমধ্যে এক ধনী ইংরেজ মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। এই মহিলার বিত্তের উপর নির্ভর করে এবারে সলভিন্স তাঁর অ্যালবামের একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশে উদ্যোগী হন। প্রকাশন কার্য শুরু হয় ১৮০৮ সালে এবং শেষ হয় ১৮১২ সালে। এই সংস্করণটিতে ২৪৮টি ছবি

আছে আর তার সঙ্গে আছে ফরাসী ও ইংরেজী ভাষায় পরিচয়-লিপি। এই পারী-সংস্করণটির নাম ছিল Les Hindous বা হিন্দুরা।

ইতিমধ্যে ১৮০৪ সনে এডোয়ার্ড অরমে নামে জনৈক ইংরেজ লণ্ডন থেকে বিনা অনুমতিতে সলভিন্সের অ্যালবামের একটি ছাটকাট-করা সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন 'দি কস্টিউমস্ অব হিন্দুস্থান' নাম দিয়ে। এতে আছে মাত্র ৬০টি ছবি। এর অধিকাংশ এনগ্রেভিং করেছিলেন স্কট। সলভিন্সের স্বকৃত এনগ্রেভিং-এর চেয়ে এগুলি উৎকৃষ্টতর। সলভিন্স কিন্তু এতে খুবই রুষ্ট হয়েছিলেন। অ্যালবামের পারী-সংস্করণের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন, "জনৈক এডোয়ার্ড অরমে লণ্ডন থেকে একটি ছাটকাট করা সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। কলকাতা থেকে আমি একসেট স্কেচ প্রকাশ করেছিলাম। এটি তার থেকে জাল করা হয়েছে বলা যায়।"

জীবিকার তাগিদেই হয়তো সলভিন্সকে ভারতবাসীর আচার-ব্যবহারের চিত্রায়ণে উদ্বুদ্ধ করেছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষকে তিনি যে ভালোবেসেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। ছবিগুলির প্রতিও ছিল তাঁর অসীম-মমতা। পারী-সংস্করণটি প্রকাশিত হবার পরও তিনি তৃপ্ত হতে পারেননি। সলভিন্স আবার তাঁর চিত্রাবলীর একটি কোয়ার্টো সংস্করণ প্রকাশে উদ্যোগী হন, কিন্তু কয়েকটি খণ্ড প্রকাশিত হবার পরই তাঁর এই নবতম প্রয়াস ব্যর্থ হয়। এই দুই অ্যালবাম প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁর স্ত্রীর বিত্ত নিঃশেষিত হয়ে যায়। ফলত শেষ জীবনে তাঁকে আর্থিক অনটনের মধ্যে কাটাতে হয়েছে।

সালভিন্স শেষ জীবনে আবার স্বদেশে ফিরে গিয়েছিলেন। সেখানে অন্তয়ার্প বন্দরে ক্যাপ্টেনের পদ পেয়েছিলেন। এখানে একটু স্থিতি হতেই তিনি নতুন একটি গ্রন্থ প্রকাশের সংকল্প করেন ভারত ও চীন ভ্রমণ সম্পর্কে। এতে ২০০ ছবি ইত্যাদি থাকবে বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু এই সংকল্প কার্যে পরিণত করতে পারার পূর্বে ১৮২৪ সালের ১০ অক্টোবর অন্তয়ার্পে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

ভেরেশ্চাগিন ও অন্যান্যরা

ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধে ঢুকে ডানদিকের একটি ঘরে গিয়ে আপনাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে। সামনে সারা দেয়াল জুড়ে মস্ত একখানা ছবি—এক রাজকীয় শোভাযাত্রার। রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড প্রিন্স অব ওয়েলস হিসাবে ভারত পরিভ্রমণের সময় জয়পুর গিয়েছিলেন। তাঁরই সম্মানে জয়পুরের মহারাজা রাম সিংহ আয়োজন করেছিলেন এই শোভাযাত্রার। সে হচ্ছে ১৮৭৬ সালের কথা।

মিছিলের পুরোভাগে নানা কারুকার্যখচিত হাওদা-আঁটা হাতির উপর মহারাজা রাম সিংহ আর প্রিন্স অব ওয়েলস্। তারপর আরও একসার হাতি। তার উপর আছেন রাজকর্মচারীরা আর আছে সেপাই-সান্ত্রী, পাইক-বরকন্দাজ। পিছনে দেখা যাচ্ছে জয়পুরের বিখ্যাত রাজপ্রাসাদ। কৌতূহলী পথচারীরা বিস্ফারিত চোখে নিরীক্ষণ করছে রাজকীয় ঐশ্বর্যের এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা।

অদ্ভুত গতিময় ছবি, বিচিত্র বর্ণসমারোহে সমুজ্জ্বল। মনে হবে, ইতিহাসের বিবর্ণ রঙচুট একটা পাতা যেন যাদুমন্ত্রবলে হঠাৎ রূপে-রসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল চোখের সামনে।

ছবিটি গত শতাব্দীর বিখ্যাত রুশ চিত্রকর ভেরেশ্চাগিনের আঁকা।

তিনি সে-সময় জয়পুর উপস্থিত ছিলেন এবং শোভাযাত্রার স্কেচ্ করে নিয়েছিলেন।

ছবিটি ছিল এডোয়ার্ড ম্যাপে নামে এক আমেরিকান ভদ্রলোকের সম্পত্তি। জয়পুরের মহারাজা ১৮৯৫ সালে ছবিটি তাঁর কাছ থেকে কিনে ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধকে উপহার দেন।[১]

ভ্যাসিলি ভ্যাসিলিয়েভিচ ভেরেশ্চাগিন ভারতে এসেছিলেন দুবার: ১৮৭৪ সালে আর ১৮৮২ সালে। একুনে বছর তিন-চারেক তিনি ভারতবর্ষে কাটিয়ে গেছেন।

ভেরেশ্চাগিন অবশ্য ভারতে প্রথম রুশ-পর্যটক নন, এমনকি প্রথম রুশ চিত্রশিল্পীও নন। পর্যটক আফানিসি নিকিতিন ভারতবর্ষে এসেছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীতে। তিনি ছিলেন বণিক। দু'খানি জাহাজে পণ্যসম্ভার সাজিয়ে ভল্গা নদীপথে তিনি যাচ্ছিলেন পারস্যে বাণিজ্য করতে। পথিমধ্যে একদল তাতার দস্যু তাঁর একটি জাহাজ দখল করে এবং অন্যটি চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়। এরপর শেমাহিন দূতের জাহাজে করে নিকিতিন ক্যাসপিয়ন সাগর পর্যন্ত পাড়ি দেন। সেখান থেকে ডরবেন্ট ও বাকুর মধ্য দিয়ে স্থলপথে পারস্যে আসেন সেখান থেকে পরে তিনি ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। নিকিতিন ভারতবর্ষে এসে পৌঁছন ১৪৭০ সালে। চার বৎসর তিনি ভারতে ছিলেন। ফিরতি পথে স্মোলেনস্ক পৌঁছবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। নিকিতিন তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা একটি ডায়রিতে লিখে রেখেছিলেন তৎকালীন ভারতবর্ষের এক কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ পাওয় যায় তাঁর এই ভ্রমণবৃত্তান্তে।[২]

ভারতে প্রথম রুশ-সংস্কৃতির দূত বলে যাঁকে চিহ্নিত করা যায় তিনি হলেন গেরাসিম লেবেদেফ (১৭৪৯)। তিনি মাদ্রাজে এসে পৌঁচেছিলেন ১৭৮৫ সালে। তখন তাঁর বয়েস মাত্র ৩৬ বছর দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্ম, সাংগীতিক প্রতিভা ছাড়া আর কোনো সম্বল তাঁর ছিল না। ঐ সম্বল নিয়েই তিনি বিশ্ব পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েছিলেন।

অনুরূপেবা দু'টি বছর দক্ষিণ ভারতে কাটিয়ে অবশেষে তিনি কলকাতা এসে পৌঁছলেন আঠারো শতকের শেষ বাগে। এ-আসা সত্যিকারের আগমন। লেবেদেফ আবিষ্কার করলেন কলকাতাকে, আর কলকাতা আবিষ্কার করল লেবেদেফকে। "সংগীত সাধনা এবং সংগীত শিক্ষা-দানের মাধ্যমে তাঁর পরিচিতির চৌহদ্দি ক্রমশ বর্ধিত হতে থাকে। তিনি শুধু নিজের দেশের সুর সাধনার মধ্যেই তাঁর শিক্ষাকে আবদ্ধ রাখতে চাননি, তিনি ভারতীয় সংগীতের সুরতরঙ্গে গানের তরী ভাসিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য তিনিই প্রথম বিদেশী সংগীতশিল্পী যিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সুরধারায় যুগ্মবেণী রচনা করেছিলেন।"[৩]

গেরাসিম লেবেদেফের নাম অবশ্য এদেশে সাধারণত স্মরিত হয় বাঙলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস প্রসঙ্গে কিন্তু তিনি রুশ প্রাচ্যবিদ্যা, বিশেষ করে ভারতবিদ্যারও একজন পথিকৃৎ।

১৮১৭ সালে তার মৃত্যু হয়। পিতার্সবার্গ (বর্তমান লেনিনগ্রাদ) সমাধিক্ষেত্রে তাঁর স্মৃতিফলকে লেখা আছে :

Here lies Lebedev, Gerassim Stepanovich, Foreign Collegium, translater of Indian vernaculars, Court Counsellor and Caveliar. He died on July 15, 1817 at the age of seventy. এরপর আছে কবিতার একটি স্তবক :

> He was first of Russia's sons
> To East India to travel.
> List the Indian Customs
> And to Russia their tongue unravel.[৪]

ভারতবর্ষে আগত প্রথম রুশ চিত্রশিল্পীর নাম সালতিকভ। ভেরেশ্চাগিনের তেত্রিশ বছর আগে এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রেখায় পটে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। সালতিকভ ভারতবর্ষে এসেছিলেন দু'বার—১৮৪১-৪৩ সালে আর ১৮৪৫-৪৬ সালে।

ভারতবর্ষ সালতিকভের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। 'ভারতের চিঠি' গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেন "ভারতের প্রকৃতি মনোমুগ্ধকর, সরল অথচ বন্য এবং রাজকীয়।" এদেশের প্রথা-প্রকরণ এবং মানুষের নীতিবোধও তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

সালতিকভের স্কেচের মধ্যে আছে গ্রীষ্মবলয়ের দৃশ্যচিত্র, তালগাছ, ভারতীয় কুটির, সুরম্য হর্ম্যমালা, পাল-পার্বণ, রাজপথে মানুষের শোভা-যাত্রা, শ্লথগতি অতিকায় হস্তি এবং বন্য জন্তু। তাঁর স্কেচের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে অসংখ্য লিথোগ্রাফ। ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে তিনি সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করেছিলেন।

তাঁর ছবির অ্যালবাম এবং ভ্রমণবৃত্তান্ত খুঁটিয়ে লক্ষ করলেই দেখা যাবে তাঁর আশে-পাশের জীবনযাত্রাকে কী তীক্ষ্ণভাবে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পর্কে তাঁর উচ্ছ্বসিত বর্ণনাই হয়তো ভেরেশ্চাগিনকে এদেশে আসবার প্রেরণা জুগিয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আরও দু'জন রুশ শিল্পী ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তাঁদের নাম কারাজিন আর সামোকিশ।

ভেরেশ্চাগিনের পেশা ছিল সৈনিক বৃত্তি আর নেশা দেশভ্রমণ ও ছবি আঁকা। জাতি-বিদ্যাতেও তাঁর উৎসাহ ছিল। ইওরোপ, আমেরিকা ও এশিয়া এই তিন মহাদেশেই তিনি ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করেছিলেন।

১৮৪২ সালের ২৬ অক্টোবর নভোগোরোদের অন্তর্গত চেরেপোভৎসএ এক অভিজাতবংশীয় জমিদার-গৃহে ভেরেশ্চাগিনের জন্ম। মায়ের কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন তাতার-রক্ত।

আট বছর বয়সে তাঁকে জারস্কোয়ে সেলোতে আলেকজাণ্ডার ক্যাডেট কোরে ভর্তি করে দেওয়া হয়। তিন বছর পরে সেন্ট পিটার্সবার্গের (অধুনা লেনিনগ্রাদ) নৌবাহিনীর শিক্ষালয়ে ভর্তি হন তিনি। প্রথম সমুদ্রযাত্রা করেন ১৮৫৮ সালে।

নৌবাহিনীর পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন

ভেরেশ্চাগিন, কিন্তু সৈন্যদলে যোগ না দিয়ে মনোনিবেশ করেন শিল্প-চর্চায়। সেন্ট পিতার্সবার্গে এবং পরে জেরোমের অধীনে তিনি অঙ্কন-বিদ্যা শিক্ষা করেন। ১৮৬৬ সনের সালোঁতে তাঁর প্রথম ছবি প্রদর্শিত হয়।

পরের বছর জেনারেল কফম্যানের তুর্কিস্তান অভিযানে যোগ দেন ভেরেশ্চাগিন এবং সমরকন্দ অবরোধের সময় বীরত্বের জন্য সেন্ট জর্জ পদক প্রাপ্ত হন।

ভেরেশ্চাগিন সৈনিক ছিলেন বটে, কিন্তু তাই বলে যুদ্ধের নৃশংসতার তিনি গুণকীর্তন করেননি। তুর্কিস্তান অভিযানের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি যেসব ছবি এঁকেছিলেন তাতে বরং তাঁর যুদ্ধের প্রতি অনাসক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়।

লড়াই থেকে ফিরে প্যারী এবং মিউনিখে তিনি ছবি আঁকার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিছুকাল কঠোর পরিশ্রমের পর একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করেন। তার মধ্যে দুটি ছবি সেকালে বেশ খানিকটা রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। একটি ছবির নাম ছিল 'যুদ্ধের মাহাত্ম্য'। ছবিটির বিষয়বস্তু—মানুষের খুলির একটি পাহাড়। তার তলায় লেখা—"অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল দিগ্বিজয়ীর উদ্দেশে" উৎসর্গ করা হল। ছবিটি বর্তমানে মস্কো'র সুবিখ্যাত ত্রেটিয়াকভ চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। অপর ছবিটির নাম 'পরিত্যক্ত'। সঙ্গীদল পরিত্যক্ত এক মুমূর্ষু সৈনিকের মর্মস্পর্শী আলেখ্য এটি।

সৈনিকবৃত্তি সম্পর্কে অশ্রদ্ধা জাগাতে পারে এই আশংকায় ছবি দুটির প্রদর্শন সেকালে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল

ভেরেশ্চাগিন ছিলেন অক্লান্ত পরিব্রাজক। ভারতে আসবার সময় তিনি তিব্বত ও হিমালয় ঘুরে আসেন। তার আগে, ১৮৬৯ সনে তিনি গিয়েছিলেন তুর্কিস্তান ভ্রমণে।

ভেরেশ্চাগিন যখন ভারতে আসেন, তখন তিনি চিত্রবিদ্যায় যথেষ্ট

পারদর্শিতা অর্জন করেছেন। তাঁর ভারত-বিষয়ক ছবিতে এই অঙ্কন-নৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বিদেশী চিত্রকরদের ছবিতে দেশীয় মানুষের আকৃতিতে যেরূপ বিদেশী ছাপ থাকে তা এখানে একেবারেই অনুপস্থিত।

ভারতে এসে ভেরেশ্চাগিন সংকল্প করেছিলেন, ইংরেজরা কিভাবে বলপূর্বক এদেশে সাম্রাজ্যবিস্তার করেছে তা নিয়ে একটি প্রামাণিক চিত্রমালা রচনা করবেন। ভেরেশ্চাগিন নিজে এ-সম্পর্কে লিখেছিলেন, "ছবিগুলির বিষয়বস্তু এমন হবে যে, তা ইংরেজের চামড়াও বিদ্ধ করবে।" কিন্তু এ-সংকল্প তিনি কার্যে পরিণত করে যেতে পারেননি।

এই পর্যায়ের মাত্র কয়েকটি ছবিই তিনি সমাপ্ত করে যেতে পেরেছিলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছবি হল—"সিপাহীদের কামানের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।" সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনার উপর ভিত্তি করে ছবিটি আঁকা।

ভেরেশ্চাগিন যখন এদেশে আসেন, তার ষোলো বছর আগে ভারতের প্রথম সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামকে (১৮৫৭-৫৮) রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিয়েছে ইংরেজরা। কোম্পানির রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে সাম্রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন। সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনা ভেরিশ্চাগিন স্বচক্ষে দেখেননি। উত্তর ভারতে ভ্রমণকালে সম্ভবত লোকমুখে তিনি বিদ্রোহের বিবরণ শুনেছিলেন।

ভেরেশ্চাগিনের ভারত-ভ্রমণ সম্পর্কিত তথ্যাদি বিরল। যতদূর জানা যায়, তিনি সিন্ধু ও গাঙ্গেয় উপত্যকায় মহারাষ্ট্র, বাঙলা, রাজপুতনা, আগ্রা, এলাহাবাদ এবং আরও কয়েকটি অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছিলেন।

ভারত থেকে তিনি প্রায় দেড়শ স্কেচ ও ছবি এঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন। ইচ্ছে ছিল, দেশে ফিরে সময়-সুযোগমত এগুলি তিনি সম্পূর্ণ করবেন। কিন্তু দেশে ফিরতে না ফিরতে আবার লড়াইয়ের বাজনা বেজে ওঠে। ১৮৭৭ সালে রুশ বাহিনীর সঙ্গে আবার তুরস্ক

অভিযানে যেতে হয় তাঁকে। ফলে শিল্পচর্চায় আবার বাধা পড়ে

এবারকার যুদ্ধে তাঁকে কিছু ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। প্লেভনার যুদ্ধে তাঁর ভ্রাতার মৃত্যু ঘটে। রাস্তাচুকের নিকট দানিয়ুব পার হবার সময় নিজে তিনি গুরুতররূপে আহত হন।

যুদ্ধশেষে তিনি কিছুকাল সান স্তেফানোয় জেনারেল স্কোবোলেভের সচিবের কাজ করেছিলেন। অতঃপর তিনি মিউনিখে এসে বসবাস করতে থাকেন। ভেরেশ্চাগিনের বিখ্যাত যুদ্ধের ছবিগুলি এই সময় আঁকা। এত তাড়াতাড়ি তিনি এই ছবিগুলি শেষ করেছিলেন যে, গুজব রটে গিয়েছিল, তিনি সহকারী নিয়োগ করেছেন।

দ্বিতীয়বার ভারত-ভ্রমণের শেষে (১৮৮৪) তিনি সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন ঘুরে এসেছিলেন এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি নিউ টেস্টামেন্টের কতগুলি ছবি আঁকেন। এই ছবিগুলিও সেকালে যথেষ্ট বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল

নেপোলিয়নের রুশিয়া অভিযানের বিষয়বস্তু অবলম্বন করেও তিনি কিছু ছবি এঁকেছিলেন। তলস্তয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' নাকি ছবি-গুলির প্রেরণা জুগিয়েছিল পরে, এই বিষয়ে একটি বইও তিনি লিখেছিলেন। ১৮৯৩ সালে মস্কো থেকে বইটি প্রকাশিত হয়। ভেরেশ্চাগিন তখন মস্কোতেই বসবাস করছিলেন।

যুদ্ধের প্রতি বিশেষ আসক্তি না থাকলেও যুদ্ধ বারে বারে ভেরেশ্চাগিনের শিল্পচর্চায় বাধা সৃষ্টি করেছে। রুশ বাহিনীর সঙ্গে মাঞ্চুরিয়া যেতে হয়েছে তাঁকে, আমেরিকান সৈন্যদলের সঙ্গে ফিলি-পাইনে। রুশ-জাপান যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই যুদ্ধে রুশিয়ার পরাজয় ঘটে আর এই যুদ্ধেই পোর্ট আর্থারের সন্নিকটে পেত্রোপাভলভ্স্ক্এ জাহাজ-ডুবিতে (১৩ এপ্রিল, ১৯০৪) মৃত্যু ঘটে ভেরেশ্চাগিনের। জাহাজটি জাপানীরা ডুবিয়ে দিয়েছিল।

ভেরেশ্চাগিন ভারতবর্ষকে পিছিয়ে-পড়া রহস্যময় দেশ হিসাবে দেখেননি—ভারতের সুপ্রাচীন সংস্কৃতি, তার শিল্পকলা ও স্থাপত্যবিদ্যার

গৌরবময় ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন তিনি। তাঁর ভারতবিষয়ক ছবিগুলির মধ্যে তাই একটা মুক্ত অনাবিল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের স্থাপত্যকলার নিদর্শন—মন্দির, মসজিদ ও মিনারের অনেকগুলি ছবি এঁকেছিলেন তিনি। অবিস্মরণীয় তাজমহলের ছবিও বাদ দেননি।

রীতির দিক থেকে ভেরেশ্চাগিন ছিলেন বাস্তবপন্থী। ফলত তাঁর ছবি থেকে তৎকালীন ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলের প্রাকৃতিক সংস্থান এবং মানুষের আচার-আচরণ এবং বেশভূষার একটা প্রামাণ্য পরিচয় পাওয়া যায়। এই দিক থেকে তাঁর ছবিগুলি ইতিহাসের উপকরণও বটে।

ভারতবর্ষে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ছাড়া দিল্লীর লালকেল্লার চিত্র-শালায়ও তাঁর কয়েকখানি ছবি আছে। ভেরেশ্চাগিনের অধিকাংশ ছবিই অবশ্য রক্ষিত আছে মস্কোর ট্রেটিয়াকভ চিত্রশালায়।

নির্দেশিকা

১। Victoria Memorial Hall by D. C. Ganguli

২। Artists Look at India: State Fine Arts Publishing House, Moscow, 1955

৩। রুশ সংস্কৃতির প্রথম যুগ লেবেদেভ: ড· অরুণ সান্যাল, রূপ-ভারতী, বর্ষ ১১, সংখ্যা ২-৩,

৪। ঐ

আরও কয়েকজন বিদেশী শিল্পী

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে যে-সব শিল্পীর কথা আলোচনা করা হয়েছে তাছাড়া আরও অনেক ইওরোপীয় শিল্পী আঠারো উনিশ শতকে এদেশে এসেছিলেন কিন্তু তাঁদের সম্পর্কে তথ্যাদি বিশেষ পাওয়া যায় না। আর্চার সাহেবের হিসাব অনুসারে এই ধরনের শিল্পীর সংখ্যা ছিল ৬০। পূর্বেই সে কথা বলা হয়েছে। এঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন পোর্ট্রেট আঁকিয়ে। তাঁদের বাদ দিলেও আর যাঁরা বাকী থাকেন তাঁদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন সম্পর্কেই কিছু তথ্য তবু জোগাড় করা গেছে। সেদিক থেকে আমার আলোচনা নিশ্চয়ই সীমাবদ্ধ এবং অসম্পূর্ণ। তবে এখানে একথাও অবশ্য বলা যেতে পারে, বিষয়টি নিয়ে বাঙলা ভাষায় আলোচনা কমই হয়েছে। সেদিক থেকে হয়তো এই অসম্পূর্ণ আলোচনাও একেবারে নিরর্থক নয়।

বিস্তৃত না হোক, আরও কয়েকজন শিল্পী সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য পাওয়া যায় কেরি সাহেবের (W. H. Carey) 'দ গুড ওল্ড ডেজ অব অনারেবল্ জন কোম্পানি' গ্রন্থে। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি থেকে তথ্যাদি এই গ্রন্থের অন্যান্য

নিবন্ধেও ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু বর্তমান অধ্যায়টি পুরোপুরি ঐ গ্রন্থ থেকেই নেওয়া, ঠিক তরজমা নয়, ভাবানুবাদ। স্থান বিশেষে কিছু সংক্ষেপও করা হয়েছে।

হিকি

মিঃ হিকি তাঁর ভারতের দিনগুলি কাটিয়েছেন প্রধানত মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে। ১৭৯৯ সালের অক্টোবর মাসে এক বিজ্ঞপ্তিতে তিনি ঘোষণা করেন, শ্রীরঙ্গপত্তন দখল সম্পর্কে নিম্নোক্ত কয়েকটি ছবি আঁকার কাজে হাত দিয়েছেন তিনি : শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ, প্রাসাদে রাজকুমারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, টিপুর দেহাবশেষ আবিষ্কার, রাজার পরিবারবর্গের সঙ্গে মহীশূরের কমিশনারের প্রথম সাক্ষাৎকার, টিপুর অন্ত্যেষ্টি, টিপুর পতাকা সহ সেণ্ট জর্জ দুর্গে লেফটন্যাণ্ট হ্যারিসের সংবর্ধনা, মহীশূরের মসনদে রাজার অভিষেক। বলা হয়েছিল লণ্ডনের বিশিষ্ট শিল্পীরা এই ছবি থেকে এনগ্রেভিং করবেন।

১৮০০ সালের ৪ মে, শ্রীরঙ্গপত্তন দখলের প্রথম বার্ষিকীতে আর্ল অব মরনিংটনের একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্য চিত্র প্রদর্শিত হয়।

হিকির সবচেয়ে সুপরিচিত প্রতিকৃতি চিত্র হল জোসিয়াস ওয়েবের। তিনি মাদ্রাজ সিভিল সার্ভিসে ছিলেন। ছবিটি যখন আঁকা হয় তখন তিনি ছিলেন মাদ্রাজ গভর্নমেণ্টের চিফ সেক্রেটারি। এই ছবিটি থেকে এনগ্রেভিং করা হয়েছিল এবং একটি প্রিণ্ট ডিউক অব ওয়েলিংটনের ডাইনিং রুমে শোভা পেত।

ওজিয়াস হমফ্রে

ওজিয়াস হমফ্রে বাঙলাদেশে আসেন ১৭৮৫ সালের গোড়ার দিকে। মিনিয়েচার ছবি আঁকিয়ে হিসেবেই ছিল তাঁর খ্যাতি। তাঁর জন্ম ১৭৪২ সালে হনিটনে এবং সেখানেই তিনি শিক্ষালাভ করেন।

চিত্রবিদ্যায় তাঁর পারদর্শিতা দেখে তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে লণ্ডন

পাঠিয়ে দেন, যাতে তিনি ভালো করে ঐ বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারেন। ছোটোবেলা থেকেই সম্ভবত তাঁর ছোটো আয়তনের প্রতি আকর্ষণ ছিল, তাই তাঁকে মিনিয়েচার পেন্টার স্যামুয়েল কলিন্সের কাছে পাঠানো হয়।

হমফ্রে লণ্ডনে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন ১৭৬৪ সালে। তাঁর বয়েস তখন বাইশ। অল্পকালের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ১৭৬৬ সালে ইংলণ্ডের রাজা তাঁকে রাণী এবং রাজ-পরিবারের অন্যান্যদের মিনিয়েচার ছবি আঁকার কাজে নিযুক্ত করেন।

লণ্ডনে হমফ্রের দিন বেশ ভালোই কাটছিল কিন্তু ১৭৭৩ সালে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে তিনি গুরুতর আঘাত পান এবং তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তিনি দেশভ্রমণে বার হন এবং রোম, নেপ্‌লস্‌ ভেনিস প্রভৃতি স্থানে যান। অনেক শিল্পীই ঐসব স্থানে গিয়ে নতুন করে প্রেরণা পেয়েছেন কিন্তু হমফ্রের ক্ষেত্রে ফল হয় উল্টো।

ঐসব স্থানে পরিভ্রমণ করে তাঁর ধারণা হয় বড়ো ছবি আঁকতে না পারলে শিল্পী হিসেবে তাঁর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। কিন্তু বড়ো ছবি আঁকার দক্ষতা সত্যিই তাঁর ছিল না। বড়ো ছবিগুলো খুব একটা সমাদরও পেল না। কিছুটা ভগ্নমনোরথ হয়েই তিনি ভারত-যাত্রা করেন।

ভারতে এসে আবার তিনি তাঁর পুরনো শৈলীতেই ছবি আঁকা শুরু করেন এবং কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, বানারস ও লখ্‌নৌতে যথেষ্ট সমাদর পান। এ-সব জায়গাতে অনেক দেশীয় রাজা এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ছবি এঁকে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেন।

মাত্র তিন বছর তিনি ভারতে ছিলেন। তারপর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ায় তাঁকে দেশে ফিরে যেতে হয়।

জন স্মার্ট

জন স্মার্ট মাদ্রাজ এসে পৌঁছান ১৭৮৮ সালে। তখন তাঁর বয়েস পঞ্চাশ। তিনিও ছিলেন মিনিয়েচার পেন্টার।

শিল্পী হিসেবে লণ্ডনে তিনি যথেষ্ট সমাদর পেয়েছিলেন কিন্তু যথেষ্ট পয়সা পাননি। তাই শেষ পর্যন্ত ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

তিনি প্রথমে আসেন মাদ্রাজ, পরে সম্ভবত কলকাতা এবং লখ্‌নৌ গিয়েছিলেন। সর্বত্রই তার মিনিয়েচার ছবির যথেষ্ট সমাদর হয়েছিল। তাঁর অঙ্কন ছিল নিখুঁত এবং রঙের ব্যবহার অতি মনোরম। ভারতে তিনি ছিলেন সাকুল্যে পাঁচ বছর। তারপর লণ্ডন ফিরে যান।

তাঁর ছেলে, তাঁরও নাম জন স্মার্ট—মাদ্রাজে ছিলেন। ১৮০৯ সালে তিনি মাদ্রাজে মারা যান। তিনিও ছিলেন শিল্পী। ১৮০০ এবং ১৮০৮ সালে তাঁর ছবি অ্যাকাডেমিতে প্রদর্শিত হয়।

আর্থার উইলিয়ম ডেভিস

আর্থার উইলিয়ম ডেভিসের জন্ম ১৭৬৩ সালে লণ্ডনে। তাঁর বাবাও ছিলেন শিল্পী। অল্প বয়সেই তাঁর মধ্যে শিল্প প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। মাত্র ১০ বছর বয়সে কোম্পানি তাঁকে ড্রাফটস্‌ম্যান হিসাবে নিযুক্ত করে এবং অ্যান্টিলোপ জাহাজে তিনি সমুদ্র যাত্রা করেন। উত্তর অ্যাটলান্টিকে জাহাজটি ডুবে যায়। তাঁরা কোনোমতে একটি জাহাজ নির্মাণ করে ম্যাকাও গিয়ে পৌঁছান।

ডেভিস কলকাতা আসেন ১৭৯১ সাল নাগাদ। তখন সেন্ট জন গির্জার নির্মাণ কার্য চলছে। জোফানির পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি এই গির্জার অলঙ্করণের ভার নেন।

১৭৯২ সালের অক্টোবর মাসে শোনা যায় তিনি রয়েছেন শান্তিপুরে। সেখানে বাঙলার কারুকলা এবং পণ্যদ্রব্যের ছবি আঁকছেন, পরে তা থেকে এনগ্রেভিং করার জন্য।

১৭৯৩ সালে টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় উপলক্ষে কোম্পানির অসামরিক কর্মচারীরা এক বিজয়োৎসবের আয়োজন করেছিলেন। এই উপলক্ষে লেফটন্যান্ট কনিংহামের একটি স্কেচ অবলম্বনে ব্যাঙ্গালোর অভিযানের একটি ছবি এঁকে দেন ডেভিস। ডেভিস একমাত্র যে

প্রতিকৃতি চিত্র এঁকেছিলেন বলে জানা যায়, সেটি হল লর্ড কর্নওয়ালিসের।

১৭৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ডেভিস টিপুর দুই পুত্রকে জামিন হিসেবে গ্রহণের ঘটনাটি অবলম্বনে আঁকা একটি ছবির প্রিন্ট প্রকাশের সংকল্প ঘোষণা করেন। ছবিটি উৎসর্গ করা হবে লর্ড কর্ণওয়ালিসের উদ্দেশে এবং দাম হবে ৮০ সিক্কা টাকা।

ভারতীয় বিষয় নিয়ে ৩০ খানারও বেশি ছবি এঁকেছিলেন ডেভিস। তার মধ্যে আবার ১০ খানাই ছিল ভারতীয় বাণিজ্য এবং পণ্য দ্রব্য সংক্রান্ত। বাকীগুলি নানা ধরনের—ভারতীয় ফকিরের ছবি, ভারতীয় রমণী, কৃষিকার্যের দৃশ্য ইত্যাদি।

ডেভিস এক বছর চীনে কাটিয়েছিলেন। তারপর আবার বাঙলা দেশে ফিরে আসেন এবং সেখানে থেকে ফিরে যান ইংলণ্ডে।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেও তিনি নিজ পেশাই অনুসরণ করতে থাকেন। সেখানে এসে তিনি অনেকগুলি ঐতিহাসিক এবং প্রতিকৃতি চিত্র আঁকেন এবং তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তবে এ-খ্যাতি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পরবর্তীকালের শিল্পীরা ডেভিসের শিল্পকর্মকে খুব একটা উচ্চ মূল্য দেননি। ১৮১১ সালে অকস্মাৎ সন্ন্যাস রোগে তাঁর জীবনান্ত হয়।

চার্লস স্মিথ

চার্লস স্মিথ নিজের পরিচয় দিতেন 'মোগল সম্রাটের চিত্রকর' বলে। তিনি ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের লোক, শিল্পীর পেশা অনুসরণের জন্য লণ্ডনে এসে বসতি করেন।

পোর্ট্রেট আঁকিয়ে হিসেবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। অ্যাকাডেমিতে তাঁর আঁকা পোর্ট্রেট প্রদর্শিতও হয়। ১৭৯৩ সালে তিনি লণ্ডন ছেড়ে এডিনবরাতে এসে বসবাস করতে থাকেন এবং সেখানে থেকে ভাগ্যান্বেষণে চলে আসেন ভারতবর্ষে।

কোন মোগল সম্রাটের চিত্রকর ছিলেন তিনি তা নিশ্চয় করে জানা যায় না। তাঁর এ-পর্যায়ের কোনো ছবিরও হদিশ পাওয়া যায় না। ১৭৯৬ সালে তিনি দেশে ফিরে যান। পরবর্তীকালে তিনি যেসব ছবি আঁকেন তাতে প্রাচ্য দেশের কোনো প্রভাব দেখা যায় না।

তিনি ছিলেন একজন অতি পরশীলিত ব্যক্তি। ১৮০২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর দুই অঙ্কের সংগীতপ্রধান প্রমোদ-নাট্য—A Trip to Bengal.

১৮২৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর বয়েস ৭৫।

জেমস ওয়েলস

বোম্বাইয়ের কাউন্সিল ভবনে তিনটি প্রতিকৃতি চিত্র ছিল, প্রথমটি বাজি রাওয়ের, দ্বিতীয়টি নানা ফড়নবিশ এবং তৃতীয়টি মাধোজি সিন্ধিয়ার। এই তিনটি প্রতিকৃতিই জেমস ওয়েলসের আঁকা। তিনি সপরিবারে ভারতে এসেছিলেন ১৭৯১ সালে।

জেমস ওয়েলসও স্কটল্যাণ্ডের লোক। শিক্ষালাভ করেছিলেন মারিশ্চাল কলেজে। যদিও রয়েল অ্যাকাডেমিতে তাঁর পোর্ট্রেট চিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল ভারতে এসে কিন্তু তিনি গুহা ভাস্কর্য এবং ঐ ধরনের শিল্পকর্মের উপরই অধিক মনোযোগ দেন। এলোরার খননকার্যে তিনি টমাস ড্যানিয়েলের সহযোগী হয়েছিলেন। তিনি এলিফ্যাণ্টাতেও সেখানকার ভাস্কর্য নিদর্শনের স্কেচ করেন। এই সব কাজ করতে গিয়েই শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হয়।

সলসেত দ্বীপে অনেক বুদ্ধ পুরাকীর্তির নিদর্শন আছে। ঐখানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চলার সময়ে মিঃ ওয়েলস্ গিয়েছিলেন তাঁর ছবি আঁকতে। ঐখানেই তিনি মারা যান।

জন অ্যালেফাউণ্ডার

জন অ্যালেফাউণ্ডার কলকাতা এসেছিলেন ১৭৮৫ সালে। তিনি সাফল্যের সঙ্গেই এখানে তাঁর পেশা অনুসরণ করে গেছেন।

১৭৮৬ সালের ২১ সেপ্টেম্বর সংখ্যা 'ক্যালকাটা গেজেট'-এ মিঃ অ্যালেফাউণ্ডারের একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এই বিজ্ঞপ্তিতে তিনি জানান, তিনি এখন সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়েছেন এবং আগেকার মতোই পোর্ট্রেট আঁকার কাজে হাত দিয়েছেন। ঐ বিজ্ঞপ্তিতে তিনি আরও জানান, তিনি যখন রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে কোনোরূপ পরামর্শ না করেই মিঃ ডেভিসের আদেশে তাঁর আঁকা ছবি (প্রধানত তাঁর বন্ধুদের প্রতিকৃতি) রঙ, ক্যানভাস ইত্যাদি বিক্রি করে দেওয়া হয়, যদিও সে সময় তিনি মতামত দেবার মতো অবস্থায় ছিলেন। যেসব ভদ্রলোক তাঁর আঁকা ঐসব ছবি, প্রিন্ট এবং আঁকার সাজ-সরঞ্জাম কিনেছেন তাঁদের কাছে তাঁর (অ্যালেফাউণ্ডার) একান্ত অনুরোধ ঐসব সামগ্রী বিশেষ করে তাঁর আঁকার পেন্সিলের অন্তত কয়েকটি তাঁরা যেন ফিরিয়ে দেন। কেননা ওগুলি কলকাতায় কিনতে পাওয়া যায় না এবং ওগুলির অভাবে তিনি ছবি আঁকতে পারছেন না।

এই আবেদনের ফল কি হয়েছিল তা অবশ্য জানা যায় না। তবে ১৭৯৪ সালে তিনি কলকাতা থেকে একটি পোর্ট্রেট দেশে পাঠিয়েছিলেন আকাদেমিতে প্রদর্শনের জন্য। পরের বছর তিনি কলকাতাতেই মারা যান।

ফ্রান্সিস সোয়েন ওয়ার্ড

ফ্রান্সিস সোয়েন ওয়ার্ড-এর জন্ম লণ্ডনে ১৭৫০ সালে। ল্যাণ্ড-স্কেপ আঁকিয়ে হিসেবে তিনি যথেষ্ট সুনামের অধিকারী হয়েছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকুরী নিয়ে তিনি কলকাতা আসেন। এখানে তিনি অনেক মন্দির এবং স্মৃতিসৌধের ছবি আঁকেন। তিনি তেল এবং জলরঙ, উভয়ই ব্যবহার করতেন।

স্যামুয়েল হাওইট

স্যামুয়েল হাওইট কলকাতা এসেছিলেন ১৭৯৪ সালে। তিনি

তার সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করেছিলেন বন্য জীবজন্তুর ছবি আঁকায়। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বিষয় ছিল বাঘ, বনাবরাহ এবং হাতি। ১৮০১ সালের মধ্যেই তিনি ৫০টি এনগ্রেভিং সমাপ্ত করেন এবং সম্ভবত সেগুলো নিয়ে নিজেই দেশে ফিরে যান।

জর্জ বিচি

জর্জ বিচি স্যার উইলিয়মের পুত্র। স্যার উইলিয়মও স্বনামধন্য শিল্পী। জর্জ বিচি পিতার অনুকরণে প্রতিকৃতি রচনা করতে শুরু করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ফ্যাশন পাল্টে গেছে। তাই জীবিকার তাগিদে শেষ পর্যন্ত তাঁকে দেশ ছাড়তে হয়। ১৮৩০ সালে তিনি কলকাতা এসে পৌঁছান। ১৮৩২ সালে তিনি কলকাতা থেকে একটি পোর্ট্রেট দেশে পাঠিয়েছিলেন প্রদর্শনীর জন্য। পরবর্তীকালে তিনি লখ্‌নৌ চলে যান এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। সিপাহী বিদ্রোহের কিছু আগে তাঁর মৃত্যু হয়।

রবার্ট হোমের পর তিনিই হন অযোধ্যার রাজদরবারের শিল্পী। তিনি অযোধ্যার নবাবের যথেষ্ট আস্থা অর্জন করতে পেরেছিলেন। নবাবের এক বিশেষ প্রিয় পাত্রীর ছবি আঁকার জন্য তাঁকে এমনকি অন্দর মহলেও প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

গ্রন্থপঞ্জী

Indian Painting for the British by William Archer

The Art of India and Pakistan Edited by L. Ashton
(British Artists in India by G. Reynolds)

British Artists in India : Journal of the Royal Society of Arts, (Vol XCVIII, May 1950)

British Artists in India by Foster, Walpole Society Journal, Vol XIX

Dictionary of British Artists by Redgrave

Dictionary of National Biography by Buckland

Dictionary of Indian Biography

Journey through the Upper Provinces of India by Bishop Heber

The Pelican History of Art

Calcutta Past and Present by Blechynden

The Good Old Days of Honorable John Company by W H. Carey

Selections from Calcutta Gazette Seaton Carr (Ed)

The Days of John Company (Selections from Calcutta Gazette 1824-1832) : A C. Dasgupta (Ed)

Calcutta and its Evirons by Hassan Suhrawardy

A People's History of England by Morton

The Nabobs by Percival Spear

The Soviet Encyclopaedia

শিল্পীদের কলকাতা : বিনয় ঘোষ, (সুন্দরম—প্রথম বর্ষ, ১ এবং ২-৩ সংখ্যা ১৩৬০)

The Victoria Memorial Hall by D. C. Ganguli

Artists look at India, State Fine Arts Publishing House, Moscow, 1955

Calcutta (1690-1930), Victoria Memorial

The Daniells by T. Sutton

John Zoffany, his life and works by Manners and Williamson

Bengal Civil Servants (1780-1838) by Dodwell and Miles
Up the Country by Emily Eden
India Illustrated by L. Gilbert
Echoes from old Calcutta by Busteed
William Hodges, Bengal Past and Present (B. P. P.) July-Sept 1925
The Daniells in India, BPP, Jan-March 1923, Jan-June 1929, July-Dec 1931
Tilly Kettle, BPP Oct Dec 1926
Robert Home BPP Jan-June 1928
Thomas Hicky BPP, Oct-Dec 1924
Chinnery, BPP Jan-Dec 1922, April June 1924
Solvyns BPP, July-Dec 1930
Beechy BPP. Jan-June 1931 ·
A Calcutta Painter, John Alefounder, BPP, July-Sept 1927
Farrington Diary BPP, Vol XXIV and XXVI
Some Prints of Old Calcutta, BPP Vol III and IV
The Russians in Asia BPP, Vol 9
Zoffany, BPP, Vols 24 25, 26, 27, 28, 29
A Lost Zoffany BPP, July-Sept 1925
D'oily BPP, Vol 24, 26, 28 29
Views in Madras by Robert Home
Select Views of Mysore by Robert Home
Hindusthan Illustrated by E. Roberts
Travels in India by William Hodges
Select Views in India by William Hodges
Voyage Pittoresque de L'Inde by William Hodges
A Picturesque Voyage to India by the Way of China by Thomas and William Daniell
The Twelve Views of Calcutta by Thomas Daniell
Oriental Scenery by Thomas and William Daniell
The Oriental Annual (in collaboration with Caunter) Daniells
India and British Painters : "Patchwork to the Great Pagoda" by Maurice Shellim
The Daniells in India by Maurice Shellim

Catalogue of Daniells work in the Victoria Memorial
Views from Calcutta by Charles D'oyly
Indian Sports by D'oyly
Costumes and Customs of Modern India by D'oyly
The European In India (Introduction by F. W. Blagdon and a preface by Capt. T. Williamson) by D'oyly
Behar Amateur Lithographic Scrapbook by D'oyly
Sketches of New Road by D'oyly
Views in Madras by George Chinnery
Sketches of Oriental Heads (1838-1850) by Colesworthy Grant
Rough Pencillings of a Rough Trip to Rangoon by C. Grant
Lithographic Sketches of the Public Characters of Calcutta by Grant
An Anglo Indian Domestic Sketch by C. Grant
Rural Life in Bengal by C. Grant
The Campaign in India (1857 58) by G. F. Atkinson
Indian Spices for English Tables by G. F. Atkinson
Curry and Rice by G. F. Atkinson
Les Hindous by Balt Solvyns
The Costumes of Hindostan by Balt Solvyns (Orme Edition)
Natives of Hindostan, Catalogue of 250 Coloured Etchings Descriptive of the Manners, Customs, Character Dress and Religious Ceremonies of the Hindus by Balt Solvyns.

—:o:—